ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

তাকিউদ্দিন আন নাবহানি

সূচীপত্র

ভূমিকা

অধ্যায় ১: অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিচিতি

পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

প্রয়োজন ও তা পূরণের উপায়সমূহ মিশ্রিতকরণ

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বনাম অর্থনৈতিক বিজ্ঞান

মানুষের প্রয়োজন কেবলই বস্তুগত

পণ্য ও সেবাসমূহ সমাজের কাঠামোর সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়

সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

অধ্যায় ২: অর্থনীতি

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি

অর্থনীতির প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী

ইসলামে অর্থনৈতিক নীতি

সাধারণ অর্থনৈতিক মূলনীতি

অধ্যায় ৩: মালিকানার প্রকারভেদ (ব্যক্তি মালিকানা)

ব্যক্তি মালিকানার সংজ্ঞা

মালিকানার অর্থ

সম্পত্তির মালিকানা লাভের পন্থা

অধ্যায় ৪: মালিকানা লাভের প্রথম উপায়: কাজ ('আমাল)

নিষ্ফলা জমিতে চাষাবাদ (ইহ্ইয়া উল-মাওয়াত)

ভূগর্ভে যা আছে তা আহরণ

শিকার

দালালি এবং কমিশন এজেন্সী (সামসারা এবং দালালা)

মুদারাবা

বর্গাচাষ (মুসাকাত)

একজন কর্মচারী বা শ্রমিককে নিয়োগ প্রদান

ভূমিকা

ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিষয়ে এ বইটি একটি অতুলনীয়, মহামূল্যবান ইসলামিক বুদ্ধিবৃত্তিক ঐশ্বর্য। বিংশ শতাব্দীতে এটাই প্রথম বই যেখানে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে সমকালীন ইসলামিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বাস্তবতাকে পরিপূর্ণরূপে তুলে ধরা হয়েছে।

বইটিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে অর্থনীতি সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এবং এর উদ্দেশ্য, কিভাবে সম্পদের মালিকানা অর্জন ও তা বৃদ্ধি করা যায়, কিভাবে তা ব্যয় ও হস্তান্তর করা যায়, কিভাবে নাগরিকদের মধ্যে সম্পদ বন্টন এবং সমাজে সম্পদের ভারসাম্য বজায় রাখা যায়।

বাইতুল মালের প্রাপ্য সম্পত্তি এবং যে খাতে তা ব্যয় করা হবে সেগুলোসহ সম্পদের প্রকারভেদ (ব্যক্তিগত, গণমালিকানাধীন এবং রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি) বইটিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

বইটি ভূমি সম্পর্কিত নিয়মনীতি ব্যাখ্যা করেছে - হোক তা উশরী বা খারাযী। জমির উপর উশর (এক দশমাংশ হারে কর) নাকি ভূমি খাজনা (খারায) প্রযোজ্য এবং কিভাবে জমি চাষাবাদ, ব্যবহার ও বন্টন হবে ও কী প্রক্রিয়ায় একজন থেকে আরেকজনের কাছে হস্তান্তরিত হবে তাও এটি ব্যাখ্যা করেছে।

বইটিতে আরো আলোচনা করা হয়েছে বিভিন্ন প্রকার মুদ্রা (নুকুদ) সম্পর্কে; রিবা (সুদ) ও বিনিময়ের সময় মুদ্রার ক্ষেত্রে কি ঘটে এবং মুদ্রার উপর যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে কি বাধ্যবাধকতা তাও আলোচনা করা হয়েছে।

পরিশেষে বইটিতে বৈদেশিক বাণিজ্য ও এর নিয়মনীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ বইয়ে গৃহিত সব হুকুমের একমাত্র উৎস হচ্ছে মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র কিতাব এবং তাঁর রাসূল (স:) এর সুন্নাহ্ এবং এগুলো থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা, যেমন কিয়াস এবং ইজমা-আস-সাহাবা। অন্য কোন উৎস থেকে এ হুকুমসমূহ গ্রহণ করা হয়নি।

এ বইটি সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বাস্তবতার সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। এছাড়া বইটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভুলসমূহের যুক্তিখন্ডনসহ তাদের ত্রুটিসমূহ এবং ইসলামিক অর্থনীতির সাথে এগুলোর সাংঘর্ষিক দিকগুলো ব্যাখ্যা করেছে।

এ বইটির নতুন সংস্করণ ছাপানোর পূর্বে সামান্য সংশোধনীসহ পুন:নিরীক্ষণ করা হয়েছিল। হাদীস উল্লেখ করবার পূর্বেসেগুলো হাদীস গ্রন্থসমূহের বর্ণনাকারী দ্বারা প্রমাণিত কিনা তা পুন:নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে খুবই সতর্ক দৃষ্টি দেয়া হয়েছিল।

ইসলামিক অর্থনীতি বিষয়ে মুসলিমদের মধ্যে সচেতনতা তৈরী করতে এই বইটি বিশাল ভূমিকা রেখেছে। আমরা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র কাছে প্রার্থনা করি, তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেন তাঁর রহমত নাজিল করেন এবং মুসলিমদেরকে এসব হুকুম আহকাম আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী পরিচালিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার সামর্থ্য প্রদান করেন।

১৪ রবিউস সানি ১৪২৫ হিজরী

২/৬/২০০৪

অধ্যায় ১: অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিচিতি

সদ্যজাত যে কোন জাতি প্রাণ লাভ করার পর তার জীবদ্দশায় প্রাপ্ত সর্বোত্তম ঐশ্বর্য হচ্ছে চিন্তা; এগুলো কোন প্রজন্মের জন্য তার পূর্ববর্তী প্রজন্ম থেকে লাভ করা সর্বোত্তম উপহার। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হল জাতির মধ্যে আলোকিত চিন্তা গভীরভাবে প্রোথিত থাকতে হবে।

বস্তুগত সম্পদ, শিল্প ও বৈজ্ঞানিক আবিস্কার এবং এ জাতীয় অন্যান্য বিষয় চিন্তার চেয়ে অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তবতা হচ্ছে, এসব বস্তুগত বিষয়াদি অর্জন এবং এগুলোর সংরক্ষণও নির্ভর করে চিন্তার উপর।

বস্তুগত সম্পদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে তা দ্রুত পুনরুদ্ধার করা সম্ভব যদি জাতি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সংরক্ষণ করে। তবে যদি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং জাতি শুধুমাত্র বস্তুগত সম্পদ দ্বারা সমৃদ্ধ হয়, তবে তা খুব দ্রুত সংকুচিত হয়ে সে জাতিকে দরিদ্রতায় নিপতিত করে। একটি জাতি তার অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক অর্জন পুনরুদ্ধার করতে পারে যদি জাতিটি তার চিন্তার প্রক্রিয়া না হারায়। আর যদি সে ফলপ্রসূ চিন্তার পথ হারিয়ে ফেলে, তবে সে খুব দ্রুত পশ্চাতমুখী হয়ে যাবে এবং তার সব আবিষ্কার ও উদ্ভাবন হারিয়ে ফেলবে। তাই প্রথমেই চিন্তার যত্ন নেওয়া অত্যাবশ্যক। এই চিন্তার উপর ভিত্তি করে ফলপ্রসূ চিন্তার পদ্ধতি দ্বারা বস্তুগত সম্পদ অর্জন করা যায় এবং সেই সাথে অর্জন করা যায় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, শিল্পের জন্য উদ্ভাবন এবং আরো অনেক কিছু।

এই চিন্তা বলতে বুঝায় জাতির মধ্যে বিদ্যমান জীবন সম্পর্কিত বিষয়ে চিন্তার একটি প্রক্রিয়া। জাতি যখন কোন ঘটনার মুখোমুখি হয় তখন বেশীরভাগ জনগোষ্ঠী সে ঘটনাকে বিচার করতে তাদের কাছে বিদ্যমান তথ্যগুলো ব্যবহার করবে এই চিন্তার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এর অর্থ এই যে, তাদের কাছে চিন্তা আছে যা তারা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করে এবং বারবার এই চিন্তা সফলভাবে ব্যবহার করার ফলে একটি ফলপ্রসূ চিন্তার প্রক্রিয়া তৈরী হয়।

আজ ইসলামিক উম্মাহ্ এমন এক সময় অতিক্রম করছে যখন অতীতের ফলপ্রসূ চিন্তার পদ্ধতি দুর্বল হয়ে পরেছে, এমনকি তা হারিয়ে যেতে বসেছিল। তবে সকল প্রশংসা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র, খিলাফত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামি জীবন ধারা পুন:প্রতিষ্ঠার দাওয়াতের প্রসারতার ফলে বিগত বছরগুলোতে এই বাস্তবতার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এটা আজ সুস্পষ্ট যে মুসলিমরা ইসলামের দিকে মুখ ফিরিয়েছে, এবং ইসলামের ধারনা, সমাধান ও হুকুমের উপর আস্থা স্থাপন করেছে। যদিও এটা পরিষ্কার যে মুসলিম ভূখন্ডে প্রচারিত সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী ধারনাসমূহের অসারতা ও এর ভ্রান্তিসমূহ জনগণের কাছে উম্মোচিত হয়ে গেছে, মুসলিম জাতি এখনও কুফর রাষ্ট্র ও তাদের দালালদের আধিপত্য মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে। এই কুফর রাষ্ট্র ও তাদের দালালরা মুসলিম ভূখন্ডে জঘন্য মিথ্যা ও প্রতারণামূলক প্রচারনার পদ্ধতি ও ধরন ব্যবহার করে তাদের বস্তা পচা ধারনা সুন্দরভাবে সাজিয়ে জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দিতে, বিশেষ করে সেসব ধারনা যা অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের সাথে সম্পর্কিত।

ফলে ইসলামিক দাওয়াত বহনকারীদের প্রথমে অবশ্যই যে ভিত্তির উপর পুঁজিবাদী সমাধানগুলো প্রতিষ্ঠিত তা প্রকাশ করে দিতে হবে, এগুলোর অসারতা তুলে ধরে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সমাধানগুলোর বিনাশ সাধন করতে হবে। দাওয়াত বহনকারীদের জীবনের নতুন ইস্যুসমূহ আলোচনা করতে হবে এবং এগুলোর সমাধান তুলে ধরে দেখাতে হবে যে, ঐশী হুকুম বিধায় তা মানতে হবে। কারণ এ হুকুমসমূহ কুর'আন ও সুন্নাহ বা এ দু'টি উৎস যে দিকনির্দেশনা দেয়, তা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। সময়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা - কখনই এ দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচ্য নয়। তার মানে ইসলামিক সমাধানকে আকীদার ভিত্তিতে গ্রহণ করতে হবে এবং কখনই তা থেকে প্রাপ্ত লাভের উপর ভিত্তি করে গ্রহণ করা যাবে না। সুতরাং প্রত্যেকটি হুকুমের সাথে যেসব ঐশী দলিল থেকে সেগুলোকে আহরণ করা হয়েছে অথবা ঐশী হুকুম বা বাণী যে ঐশী কারণ বা ইল্লাহ্ নিয়ে এসেছে তা উপস্থাপন করতে হবে।

শাসন ব্যবস্থা ও অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত চিন্তাসমূহ মুসলিমদেরকে সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ করে এবং এগুলোর জন্য তাদেরকে জীবনে সবচেয়ে বেশী যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে। মুসলিমরা সাধারণত এ চিন্তাগুলোকে প্রশংসা করে। অন্যদিকে পশ্চিমারা বাস্তবে এই চিন্তাগুলো প্রয়োগ করার চেষ্টা করে, এমনকি তারা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অধ্যবসায়ী। যদিও উম্মাহ্ উদ্দেশ্যমূলকভাবে কাফের উপনিবেশবাদীদের দ্বারা তাত্ত্বিকভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত, পশ্চিমা ব্যবস্থা ও উপনিবেশবাদ বজায় রাখার জন্য উম্মাহ্ বাস্তবে অর্থনৈতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত। সুতরাং ইসলামিক অর্থনৈতিক চিন্তা স্বাভাবিকভাবেই ইসলামিক বিশ্বের মুসলিমদের অর্থনৈতিক জীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করবে। এই প্রভাব এতটাই বেশী হবে যে উম্মাহ্ চলমান ব্যবস্থা উল্টে দিতে উদ্বুদ্ধ হবে। আর কাফের উপনিবেশবাদী, পশ্চিমাদের গুণমুগ্ধ লোকজন - বিশেষ করে যারা অন্ধকারে থাকতে পছন্দ করে, যারা পরাজিত মানসিকতা সম্পন্ন ও শাসকগোষ্ঠী এই ইসলামিক অর্থনৈতিক চিন্তার তীব্র বিরোধিতা করবে।

সুতরাং পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি সঠিক চিত্র তুলে ধরা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে, যে চিত্র সুবিন্যস্ত আকারে পশ্চিমা রাজনৈতিক অর্থনীতি যে মৌলিক চিন্তার উপর প্রতিষ্ঠিত তা প্রকাশ করবে। এটা এজন্য প্রয়োজন যাতে করে পশ্চিমা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দ্বারা মুগ্ধ লোকেরা এ ব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ ও ইসলামের সাথে এর সাংঘর্ষিক দিকসমূহ উপলব্ধি করতে পারে। অত:পর তারা অর্থনৈতিক জীবনের সমস্যা সঠিকভাবে সমাধানকারী ইসলামিক

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চিন্তাসমূহ পরীক্ষা করে দেখতে পারবে এবং তাদের কাছে এটি সাধারণ মূল নীতি ও বিস্তারিত - উভয় আঙ্গিকে পুঁজিবাদী জীবন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হিসেবে উপস্থাপিত হবে।

পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

আমরা যদি পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরীক্ষা করে দেখি, তাহলেদেখতে পাব যে এর দৃষ্টিভঙ্গি হল এটি মানুষের প্রয়োজন (needs) এবংএসব প্রয়োজন পূরণের উপকরণ নিয়ে কাজ করে। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ধব্যবস্থা মানুষের কেবলমাত্র বস্তুগত দিকটি নিয়েই আলোচনা করে এবংএটি তিনটি মূল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত:

- প্রয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট পণ্য ও সেবার আপেক্ষিক অভাব (relative scarcity) রয়েছে। এর অর্থ হল মানুষের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন পূরণের জন্য পণ্য ও সেবার অপর্যাপ্ততা। তাদের দৃষ্টিতে এটাই হল সমাজের অর্থনৈতিক সমস্যা।
- অধিকাংশ অর্থনৈতিক গবেষণা ও অধ্যয়নের ভিত্তি হল উৎপাদিত পণ্যের মূল্য (value)।
- উৎপাদন, ভোগ ও বন্টনে দামের (price) ভূমিকা। দাম হল পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি মৌলিক বিষয়।

পণ্য ও সেবার আপেক্ষিক অভাবের ক্ষেত্রে বলা যায়, পণ্য ও সেবা মানুষের অভাব পূরণের উপকরণ হওয়ায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। তারা বলে মানুষের প্রয়োজন রয়েছে যা পূরণ করতে হয় এবং এ প্রয়োজন পূরণের উপকরণ থাকতেই হবে। এ প্রয়োজনসমূহ পুরোপুরিই বস্তুগত (materialistic)। এগুলো হয় দৃশ্যমান (tangible), যেমন: খাদ্য ও বস্ত্রের প্রয়োজন, অথবা এমন সব প্রয়োজন যা মানুষ অনুভব করে এবং এগুলো অদৃশ্যমান (intangible) অর্থাৎ সেবার প্রয়োজন, যেমন: ডাক্তার বা শিক্ষকের সেবা। নৈতিক প্রয়োজন, যেমন: গৌরব ও সম্মান অথবা আধ্যাত্মিক প্রয়োজন, যেমন: স্রষ্টার উপাসনা করা, এগুলো অর্থনৈতিকভাবে স্বীকৃত নয়। একারণে এগুলো পরিত্যাগ করা হয়, ফলে অর্থনৈতিক আলোচনায় এগুলোর কোন স্থান নেই।

প্রয়োজন পূরণের উপকরণসমূহকে পণ্য ও সেবা বলা হয়। পণ্য হল দৃশ্যমান প্রয়োজন পূরণের উপকরণ এবং সেবা হল অদৃশ্যমান প্রয়োজন পূরণের উপকরণ। তাদের দৃষ্টিতে যা পণ্য ও সেবাকে প্রয়োজন পূরণকরতে দেয়, তা হল পণ্য ও সেবার মধ্যে থাকা সুযোগ-সুবিধা বাউপযোগ। এই উপযোগ এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা প্রয়োজন পূরণের জন্য আকাঙ্খিত বস্তু থেকে পাওয়া যায়। যেহেতু প্রয়োজন হল অর্থনৈতিক আকাঙ্খা, সেহেতু আকাঙ্খিত প্রতিটি বস্তুই অর্থনৈতিকভাবে উপকারী –হোক তা অপরিহার্য বা তা নয়, কিংবা কিছু সংখ্যক লোক এটিকে উপকারী মনে করুক এবং অন্য কিছু সংখ্যক এটিকে ক্ষতিকর মনে করুক। এটি ততক্ষণ পর্যন্ত অর্থনৈতিকভাবে উপকারী যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ একে আকাঙ্খিত মনে করে। যেকোন বস্তুকে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক কিনা শুধুমাত্র সে দৃষ্টিতে বিবেচনা করা হয়, যদিও বা জনমত এটিকে অলাভজনক বা ক্ষতিকারক মনে করে। সেকারণে মদ ও হাশিশ অর্থনীতিবিদদের কাছে লাভজনক, কেননা কিছু লোক এগুলো চায়।

অন্য কোন বাস্তবতা বিবেচনায় না এনে কেবলমাত্র প্রয়োজন পূরণ করে –এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অর্থনীতিবিদ প্রয়োজন পূরণের উপকরণের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করে অর্থাৎ পণ্য ও সেবার দিকে লক্ষ্য করে। সুতরাং সে প্রয়োজনও উপযোগ এ দু'টি যেরূপ বিদ্যমান ঠিক সেভাবেই দেখে, কিন্তু এগুলো কিরকম হওয়া উচিত সেদিকে দৃষ্টিপাত করেনা অর্থাৎ সে অন্য কোনকিছুকে বিবেচনায় না এনে উপযোগকে প্রয়োজন পূরণের নিয়ামক হিসেবে দেখে। সুতরাং কিছু লোকের চাহিদা মেটানোর কারণে সে মদকে অর্থনৈতিকভাবে মূল্যবান হিসেবে বিবেচনা করে এবং অর্থনৈতিক মূল্যবিবেচনা করে মদ প্রস্তুতকারীকে একজন সেবাপ্রদানকারী হিসেবে মনেকরে। কারণ এটি কিছু ব্যক্তির অভাব পূরণ করে।

এটিই হল পুঁজিবাদে প্রয়োজন ও তা পূরণের উপকরণের প্রকৃতি। সেকারণে অর্থনীতিবিদ সমাজের প্রকৃতির তোয়াক্কা করে না, কিন্তু তারা অর্থনৈতিক বস্তুগত সম্পদ বা অর্থনৈতিক পণ্যের ব্যাপারে যত্নশীল কারণএগুলো প্রয়োজন পূরণ করে। সুতরাং তাদের মতানুসারে অন্য কোন কিছু বিবেচনায় না এনে মানুষের প্রয়োজন পূরণের উপকরণ যোগানের জন্যপণ্য ও সেবা সরবরাহ নিশ্চিত করা দরকার। অর্থাৎ, প্রয়োজন পূরণের উপকরণ সরবরাহ করা দরকার। প্রয়োজন পূরণের উপকরণ হিসেবে পণ্যও সেবা যেহেতু সীমিত সেহেতু এগুলো মানুষের সব প্রয়োজন পূরণের জন্য পর্যাপ্ত নয়। কারণ তাদের দৃষ্টিতে এই প্রয়োজনসমূহ অসীম এবং ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি একারণে যে, মানুষের রয়েছে এমন কিছ মৌলিক প্রয়োজন যা তাকে পূরণ করতেই হয় এবং এমন কিছু প্রয়োজনরয়েছে যা নগরায়নের সাথে সাথে বৃদ্ধি পায়। এ চাহিদাসমূহ গুনিতকহারে বাড়তেই থাকে এবং এগুলো পুরোপুরি পূরণ করা দরকার। যদিও পণ্য ও সেবা যতই বৃদ্ধি পাক না কেন, এগুলো কখনই পূরণ হবার নয়। এ ভিত্তি থেকে অর্থনৈতিক সমস্যার সূত্রপাত হয়, যা হল প্রয়োজনের অতিরিক্ত বোঝা এবং এগুলো পূরণের জন্য উপকরণের অপ্রতুলতা অর্থাৎ মানুষের সব অভাব পূরণের জন্য পণ্য ও সেবার অপ্রতুলতা।

এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমাজ একটি অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং তাহল পণ্য ও সেবার আপেক্ষিক দুষ্প্রাপ্যতা। এ দুষ্প্রাপ্যতার অপরিহার্য ফলহল কিছু প্রয়োজন আংশিকভাবে পূরণ হয় এবং কিছু কখনই পূরণ হয় না। যেহেতু এটাই হল অবস্থা সেহেতু এটি অপরিহার্য যে সমাজের সদস্যগণএমন

আইনের ব্যাপারে একমত হবেন – যা নির্ধারণ করবে কোন প্রয়োজনগুলো পূরণ হওয়া উচিত এবং কোনগুলো নয়। অন্যকথায় এমন আইন প্রণয়ন করা জরুরী যা অসীম অভাব পূরণ করার জন্য সীমিত সম্পদ বন্টনের ব্যবস্থা করবে। সুতরাং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের চেয়ে প্রয়োজন ও সম্পদকে বেশী গুরুত্ব প্রদান করেছে। অর্থাৎ সমস্যা হল প্রয়োজন পূরণের জন্য সম্পদকে সুলভ করতে হবে, কিন্তু সেটা প্রত্যেকব্যক্তির জন্য নয়। সুতরাং এটি অপরিহার্য যে যেসব আইন প্রণয়ন করা হবে সেগুলোকে অবশ্যই সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদনের নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে যাতে করে সম্পদের সর্বোচ্চ সরবরাহ অর্জন করা সম্ভবপরহয়। অর্থাৎ সামগ্রিতকভাবে জাতির কাছে পণ্য ও সেবা সরবরাহ করা যায়,অবশ্যই প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে নয়। সুতরাং পণ্য ও সেবার বন্টন উৎপাদনের সমস্যার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং অর্থনীতি অধ্যয়ন ও গবেষণার উদ্দেশ্য হল সমাজের ভোগের জন্য পণ্য ও সেবা বৃদ্ধি করা। সুতরাং এটি অবাক হওয়ার বিষয় নয় যে যেসব নিয়ামক জাতীয় আয়ের (GDP and GNP) আকারকে প্রভাবিত করে সেগুলোর অধ্যয়ন বাদ বাকী সব কিছুর উপর প্রাধান্য লাভ করে। কারণ জাতীয় আয় বৃদ্ধির অধ্যয়ন অর্থনৈতিক সমস্যা অর্থাৎ প্রয়োজনের বিপরীতে পণ্য ও সেবার দুস্প্রাপ্যতার সমস্যার সমাধান করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ তারা মনে করে উৎপাদন বৃদ্ধি করা ছাড়া দরিদ্রতা ও বঞ্চনা নিরসন করা সম্ভব নয়। সুতরাং সমাজ যেসব অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে সেগুলোর সমাধান কেবলমাত্র উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমেই করা সম্ভব।

উৎপাদিত পণ্যের মূল্য (value) বলতে এর গুরুত্বের মাত্রাকে বুঝায়; যেখানে কোন এক বিশেষ ব্যক্তির বা কোন এক বিশেষ বস্তুর সাপেক্ষে সেমাত্রা নির্ধারিত হয়। প্রম ক্ষেত্রে এটাকে 'উপযোগের মূল্য' (the value of the benefit) বলা হয় এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এটিকে 'বিনিময়ের মূল্য' (value of exchange) বলা হয়। একটি বস্তু থেকে প্রাপ্ত উপযোগকে যেভাবে বর্ণনা করা যায় তার চুম্বকাংশ হল: একটি বস্তুর যে কোন এককেরউপযোগের মূল্য এর প্রান্তিক উপযোগ দ্বারা পরিমাপ করা হয় অর্থাৎ সর্বনিম্নব প্রয়োজন যে পরিমাণ বস্তু দ্বারা পূরণ করা যায় সে পরিমাণ বস্তুর উপযোগ। তারা এটিকে 'প্রান্তিক উপযোগ তত্ত্ব' বা 'The Theory of Marginal Utility' বলে। এর অর্থ হল উপযোগ কেবলমাত্র এর উৎপাদকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পরিমাপ করা হয় না অর্থাৎ উৎপাদন খরচ দ্বারা মূল্যায়িত হয় না, তাহলে সেক্ষেত্রে চাহিদা বিবেচনা না করে কেবল যোগানই বিবেচনা করা হত। আবার এটিকে কেবলমাত্র ভোক্তার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিবেচনা করা ঠিক হবে না অর্থাৎ এর উপযোগ এবং চাহিদা বিবেচনা করার সাথে সাথে এর আপেক্ষিক দুস্প্রাপ্যতা বিবেচনা করতেহবে। কেননা এতে করে যোগানের বিষয়টি হিসেবে না এনে চাহিদা বিবেচনা করা হবে। বাস্তবিকভাবে তারা বলে যে, যোগান ও চাহিদার ভিত্তিতে একত্রে উপযোগকে দেখা উচিত। সুতরাং সর্বনিম্ন যে উপযোগ প্রয়োজন পূরণ করে তার ভিত্তিতে একটি বস্তুর উপযোগ পরিমাপ করা হয় অর্থাৎ সন্তুষ্টির সর্বনিম্নব বিন্দু থেকে। সুতরাং এক টুকরো রুটির মূল্য সবচেয়ে কম ক্ষুধার্ত থাকা অবস্থায় পরিমাপ করা হবে, সর্বাধিক ক্ষুধার্ত অবস্থায় নয় এবং সেসময় বাজারে রুটি সুলভ থাকতে হবে এবং যখন সুলভ নয় এমন অবস্থায় পরিমাপ করা যাবে না।

বিনিময়ের মূল্যের ক্ষেত্রে বলা যায়, এটি হল একটি বস্তুর এমন বৈশিষ্ট্য যা থাকার কারণে সেটি বিনিময়ের উপযোগী হয়। একটি বস্তুর বিনিময়ের শক্তিমত্তা আপেক্ষিকভাবে অন্য একটি বস্তুর সাথে তুলনা করে নিরূপণ করা হয়; যেমন: ভূট্টার সাথে গমের বিনিময় মূল্য হিসেব করতে হলে দেখতেহবে এক একক গম পাবার জন্য কত একক ভূট্টা বিনিময় করতে হয়। তারা কেবলমাত্র 'উপযোগ' শব্দ দ্বারা উপযোগের মূল্য এবং কেবলমাত্র 'মূল্য' শব্দ দ্বারা বিনিময়ের মূল্য বুঝিয়ে থাকে।

মূল্যের দিক থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ দু'টি পণ্য ও সেবার মধ্যে বিনিময় সংঘটিত হয়। সে কারণে অর্থনীতিবিদদের জন্য মূল্য অধ্যয়ন করা অপরিহার্য। কেননা এটি হল বিনিময়ের ভিত্তি এবং এমন একটি উপযোগ যা পরিমাপ করা যায়। এটি এমন একটি মানদন্ড যার মাধ্যমে পণ্য ও সেবা পরিমাপ করা হয় এবং এর মাধ্যমে কোন কাজ উৎপাদনমুখী কিনা তা পরিমাপ করা হয়।

তাদের দৃষ্টিতে উৎপাদন হল কাজের মাধ্যমে উপযোগ সৃষ্টি বা বৃদ্ধি করা। সুতরাং কোন কাজটি উৎপাদনশীল এবং কোনটির অনেক বেশীউৎপাদনশীলতা রয়েছে তা চিহ্নিত করার জন্য বিভিনড়ব উৎপাদিত পণ্য ওসেবার জন্য একটি সূক্ষ্ম মানদন্ড থাকা উচিত। এ মানদন্ড হল বিবিধ পণ্যও সেবার বিষয়ে সামাজিক মূল্য। অন্য কথায় এটি হল ব্যয়কৃত শ্রম ও প্রদত্ত সেবার যৌথ মূল্যায়ন। আধুনিক সময়ে 'ভোগ করার জন্য উৎপাদন'দ্বারা 'বিনিময়ের জন্য উৎপাদন' প্রতিস্থাপিত হওয়ায় এ মূল্যায়ন অপরিহার্যহয়ে পড়েছে। অবস্থা এখন এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, কার্যত প্রত্যেক ব্যক্তিতার উৎপাদনকে অন্য আরেকজনের উৎপাদিত পণ্যের সাথে বিনিময় করে থাকে। পণ্য ও সেবার ক্ষতিপূরণের (compensation) মাধ্যমে বিনিময়সম্পাদিত হয়। সেকারণে পণ্যেরমূল্যের ক্ষেত্রে একটি মানদন্ড থাকা উচিত যাতে করে বিনিময় করা যায়। সুতরাং উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে 'মূল্য কী' – সে ব্যাপারে জ্ঞান থাকা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে অর্থাৎ উপকরণসমূহ ব্যবহার করে মানুষের অভাব পূরণ করার ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় উপাদান।

আধুনিক ইতিহাসে, এ বিনিময়ের মূল্যকে এর একটি মূল্য দ্বারা চিহ্নিতকরা হয় এবং এ ধরনের মূল্য প্রণিধানযোগ্য হয়ে পড়েছে। উন্নত সম্প্রদায়ে পণ্যসমূহের মূল্য একটি আরেকটির সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়, বরংএকটি বিশেষ পণ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত – যাকে অর্থ (money) বলা হয়। অর্থের সাথে কোন পণ্য বা সেবার বিনিময়ের অনুপাতকে তাদের দাম(ঢ়ৎরপব) বলা হয়। সুতরাং দাম হল অর্থের তুলনায় একটি পণ্য বা সেবারবিনিময়ের পরিমাণ। অতএব বিনিময়ের মূল্য (value of exchange) ওদামের (price) মধ্যে পার্থক্য হল বিনিময়ের মূল্য হল একটি বস্তুর সাথেঅপর কিছুর বিনিময়ের হার – হতে পারে সেটি অর্থ, পণ্য বা সেবা।অন্যদিকে দাম হল অর্থের সাথে বিনিময় মূল্য। এর অর্থ হল সব পণ্যেরদাম একটি নির্দিষ্ট সময়ে একসাথে বাড়তে

পারে এবং অপর একটি নির্দিষ্টসময়ে একসাথে হ্রাস পেতে পারে। অন্যদিকে একে অপরের তুলনায়আপেক্ষিকভাবে সব পণ্যের বিনিময় মূল্য একটি নির্দিষ্ট সময়ে একসাথেবাড়া বা কমা সম্ভব নয়। আবার বিনিময় মূল্যে কোনরূপ পরিবর্তন না এনেপণ্যের দামে পরিবর্তন আসা সম্ভব। সুতরাং পণ্যের দাম হল এরমূল্যসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি। অন্য কথায় এটি অর্থের তুলনায়পরিমাপ করা একটি মূল্যমাত্র। যেহেতু দাম হল অন্যতম একটি মূল্যসেহেতু একটি বস্তু উপকারী কিনা বা উপযোগের মাত্রা কতটুকু সেব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য দামকে ব্যবহার করা স্বাভাবিক। সুতরাংএকটি পণ্যকে ফলদায়ক ও উপকারী তখনই বিবেচনা করা হবে যখনসমাজ এ বিশেষ পণ্য ও সেবাকে একটি দাম দ্বারা মূল্যায়ন করে। পণ্য বা সেবার উপযোগের মাত্রা এমন একটি দাম দ্বারা পরিমাপ করা হয় যা অধিকাংশ ভোক্তা মালিকানায় নেয়া বা সদ্ব্যবহার করবার জন্য দিতে সম্মত থাকে – হোক সে পণ্য কৃষিজাত বা শিল্পজাত এবং সে সেবা একজন ব্যবসায়ী, পরিবহন শ্রমিক, ডাক্তার বা প্রকৌশলীর।

উৎপাদন, ভোগ, বন্টনের ক্ষেত্রে দাম যে ভূমিকা রাখে তা হল, দামের ব্যবস্থাপনা (price mechanism) নির্ধারণ করে কোন উৎপাদক পণ্যউৎপাদন করবে এবং কোন উৎপাদক পণ্য উৎপাদন করবে না।একইভাবে দামই নির্ধারণ করে কোন ভোক্তা পণ্য দিয়ে তার প্রয়োজনমেটাবে এবং কোন ভোক্তা পণ্য ভোগ করতে সমর্থ হবে না। একটিপণ্যের উৎপাদন খরচ বাজারে এর সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রধান নিয়ামক ও পণ্যের উপযোগ বাজারে এর চাহিদা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা রাখে এবং উভয়ক্ষেত্রে দাম দ্বারা এসব পরিমাপ করা হয়। সুতরাং পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে চাহিদা ও যোগান (demand and supply) অধ্যয়ন করা মৌলিক ইস্যু। যোগান বলতে বাজারে সরবরাহ করা বুঝায় এবং একইভাবে চাহিদা বলতে বাজারের চাহিদা বুঝায়। চাহিদা দাম উল্লেখ ব্যতিরেকে যেমনি বলা যায় না, তেমনি সরবরাহও দাম ব্যতিরেকে মূল্যায়ন করা যায় না। তবে চাহিদা দামের ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয়,অর্থাৎ যদি দাম বাড়ে তাহলে চাহিদা কমে এবং দাম কমলে চাহিদা বাড়ে। সরবরাহের ক্ষেত্রে এ সম্পর্কটি ঠিক উল্টো, অর্থাৎ দামের অনুপাতেযোগান পরিবর্তিত হয়। সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় যদি দাম বাড়ে এবং সরবরাহ হ্রাস পায় যদি দাম কমে যায়। যোগান ও চাহিদা এ উভয় ক্ষেত্রে দামের সবচেয়ে বড় প্রভাব রয়েছে; ফলে উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে ও রয়েছে এর বড় প্রভাব।

পুঁজিবাদীদের মতে দামের ব্যবস্থাপনা হল সমাজে ব্যক্তির মধ্যে পণ্য ও সেবা বন্টনের আদর্শ পদ্ধতি। কেননা মানুষ যে শ্রম ব্যয় করে তার ফলই হল উপযোগ। সুতরাং ক্ষতিপূরণ (compensation) যদি শ্রমের সমান না হয় তাহলে সন্দেহাতীতভাবে উৎপাদন কমে যাবে। সুতরাং সমাজে পণ্য ও সেবা বন্টনের আদর্শ পদ্ধতি হল এমন একটি ব্যবস্থা যা সর্বোচ্চ উৎপাদনকে সুনিশ্চিত করে। এ পদ্ধতিহল দামের পদ্ধতি – যাকে দামের ব্যবস্থা বা দামের ব্যবস্থাপনা বলা হয়। তারা মনে করে দামের ব্যবস্থাপনা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অর্থনৈতিক সাম্যাবস্থার (economic equilibrium) সৃষ্টি করে। যেহেতু এটি ভোক্তাকে কিছুপণ্যের ব্যাপারে তার চাহিদা এবং অন্যকিছুর ব্যাপারে চাহিদা না থাকারভিত্তিতে বিভিনড়ব অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে অর্জিত সমাজেরমালিকানাধীন সম্পদের বন্টনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পছন্দ করারসুযোগ দেয়। সুতরাং যা প্রয়োজন ও পছন্দনীয় তা ক্রয় করার জন্যতাদের আয়কে ব্যয় করে। সুতরাং যে ভোক্তা মদ পছন্দ না করে সে সেটি ক্রয় না করে অন্য কিছুর পেছনে তার আয় ব্যয় করবে। মদ অপছন্দ করেএমন ক্রেতার সংখ্যা যদি বৃদ্ধি পায়, অথবা সবাই মদকে অপছন্দ করা শুরু করে, তাহলে ক্রমহ্রাসমান চাহিদার কারণে মদ উৎপাদন করাঅলাভজনক হয়ে যাবে। এভাবে মদের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাবে এবংএকই নিয়ম অন্য পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ভোক্তাগণ কী ক্রয় করবে এবং কী ক্রয় করবে না এ ব্যাপারে তারা স্বাধীন বিধায় উৎপাদনের পরিমাণ ও প্রকরণকে তারাই নির্ধারণ করে। তারা তা করে দামের মাধ্যমেএবং পণ্য ও সেবার বন্টনও ঘটে, যদিও ভোক্তা কর্তৃক প্রদেয় দাম সরাসরি উৎপাদক পায় না এবং ভোক্তা উৎপাদককে দেয়ও না।

দামের ব্যবস্থাপনা উৎপাদনের উদ্দীপক। এটি বন্টনের নিয়ন্ত্রক এবংউৎপাদক ও ভোক্তার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনকারী, অর্থাৎ এটি এমন একটি উপায় যার মাধ্যমে উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে সাম্যাবস্থা অর্জন হয়।

দামের ব্যবস্থাপনা উৎপাদনের উদ্দীপক, কেননা যে কোন মানুষের কোন ফলদায়ক প্রচেষ্টা ও ত্যাগের কারণ হল বস্তুগত লাভ। পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদরা এ সম্ভাবনা বাদ দিয়েছে যে কোন মানুষ আধ্যাত্মিক বা নৈতিক কারণে প্রচেষ্টা চালাতে পারে। যখন তারা নৈতিক উদ্দেশ্যকে সনাক্ত করে তখন সেটিকে বস্তুগত লাভের জন্য করা হয় বলে ধরে নেয়। তারা বিবেচনা করে যে, মানুষ কেবলমাত্র তার বস্তুগত অভাব ও ইচ্ছা পূরণের জন্য প্রচেষ্টা ব্যয় করে। এ প্রয়োজন পূরণ হতে পারে ব্যক্তি সরাসরি যা উৎপাদন করে সেগুলোর ভোগ থেকে অথবা এমন কোন আর্থিক পুরস্কার থেকে যার মাধ্যমে সে অন্যদের উৎপাদিত পণ্য ও সেবা ক্রয় করতে সক্ষম হয়। যেহেতু মানুষ অন্যের সাথে প্রচেষ্টা বিনিময় করার মাধ্যমে তার অধিকাংশ বা সব প্রয়োজন পূরণের জন্য অন্যের উপর নির্ভরশীল, সেহেতু প্রয়োজন পূরণ করার প্রচেষ্টা আর্থিক পুরস্কারের দিকে কেন্দ্রীভূত হয়। এই আর্থিক পুরস্কার তাকে পণ্য ও সেবা প্রাপ্তিতে সহায়তা করে এবং একইভাবে সে যেসব পণ্য উৎপাদন করে তা পাওয়া তার লক্ষ্যথাকে না। সুতরাং আর্থিক পুরস্কার বা দাম পণ্য উৎপাদনের জন্য মূল লক্ষ্যহিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ দাম হল এমন একটি উপায় যা উৎপাদককেতার প্রচেষ্টা বিনিয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং দাম উৎপাদনের উদ্দীপক।

দাম হল এমন একটি উপায় যা বন্টনকে নিয়ন্ত্রণ করে। কারণ মানুষ তার সব প্রয়োজন পুরোপুরি পূরণ করতে চায় এবং প্রয়োজন পূরণের জন্য পণ্যও সেবা অর্জনে সে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালায়। যদি প্রত্যেক মানুষকে তারপ্রয়োজন পূরণের জন্য স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হত তাহলে সে তার পছন্দমত যে কোন পণ্য লাভ করতে ও ভোগ করতে ক্ষান্ত হত না। যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তি একই লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রচেষ্টা চালায়, সেহেতু একজন মানুষকে তার

প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে সে সীমায় থেমে যেতে হয় যেখানে সে নিজের প্রচেষ্টা অন্যের প্রচেষ্টার সাথে বিনিময় করতে সমর্থহয়, অর্থাৎ তার প্রচেষ্টার কারণে সে যে আর্থিক ক্ষতিপূরণ লাভ করে সে সীমা পর্যন্ত অর্থাৎ দামের সীমা পর্যন্ত। সুতরাং দাম স্বাভাবিকভাবে মানুষকে কোন কিছু লাভ ও ব্যয় করার ক্ষেত্রে একটি সীমার মধ্যে বেধে রাখার জন্য বাধ্য করে এবং এই সীমাটি হল তার আয়ের সীমা। সুতরাং দাম মানুষকে চিন্তা, মূল্যায়ন, তার পূরণ করতে হবে এমন তুলনামূলক প্রয়োজনের মধ্যে পার্থক্য করতে দেয়, অর্থাৎ যা তার জন্য অপরিহার্য সেটি সে গ্রহণ করে এবং যা কম গুরুত্বপূর্ণ তা ছেড়ে দেয়। সুতরাং দাম কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে ভোক্তাকে আংশিক চাহিদা পূরণ করতে বাধ্য করে – যাতেকরে গুরুত্বপূর্ণ অন্য প্রয়োজনগুলো সে পূরণ করতে পারে।

সুতরাং দাম হল এমন একটি উপায় যা ব্যক্তির জন্য প্রয়োজনীয় উপযোগসমূহের বন্টন নিয়ন্ত্রণ করে। উপযোগ প্রাপ্তির আকাঙ্খা করে এমন ভোক্তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ উপযোগের বন্টনকে নিয়ন্ত্রণ করে দাম। ভোক্তাদের আয়ের বৈষম্যের কারণে তাদের আয় তাদের ব্যয়কে একটি সীমার মধ্যে বেধে রাখে। এর কারণে কিছু পণ্য কেবল সামর্থবান লোকেরাই ভোগ করতে পারে এবং বাকী কিছু পণ্য কম দামের হওয়ায় সবাই ভোগ করতে পারে। সুতরাং কিছু পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে দাম বেশীও অন্য কিছুর জন্য দাম কম এবং কিছু ভোক্তার চেয়ে অন্য কিছু ভোক্তার কাছে দামের তুলনামূলক যথার্থতা ঠিক করে দেয়ার মাধ্যমে দাম ভোক্তাদের মধ্যে উপযোগ বন্টনের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রকের কাজ করে।

দাম উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে সাম্যাবস্থা আনয়ন করে এবং এটি উৎপাদক ও ভোক্তার মধ্যকার সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। কেননা ভোক্তার আকাঙ্খা পূরণকারী উৎপাদক লাভের মাধ্যমে পুরস্কৃত হন। অন্যদিকে যেসব উৎপাদকের পণ্য ভোক্তাদের দ্বারা গৃহীত হবে না, সে লোকসানের মাধ্যমে শেষ হয়ে যাবে। যে পদ্ধতির মাধ্যমে উৎপাদক ভোক্তার আকাঙ্খা চিহ্নিত করে, তা হল দাম। যদি ভোক্তার কাছে কোন পণ্যের চাহিদা থাকে তাহলে এর দাম বেড়ে যাবে, ফলে ভোক্তার আকাঙ্খাপূরণ করতে গিয়ে এর উৎপাদনও বেড়ে যাবে। যদি ভোক্তাগণ একটি বিশেষ পণ্য ক্রয় করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে বাজারে এর দামকমে যাবে ও সে পণ্যের উৎপাদন হ্রাস পাবে। সুতরাং পণ্যের দাম বাড়ার সাথে সাথে উৎপাদনের জন্য বিনিয়োগকৃত সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং দাম কমার সাথে সাথে হ্রাস পায়। এভাবে উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে সাম্যাবস্থা অর্জনে দাম সহায়তা করে এবং উৎপাদক ও ভোক্তার মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করে এবং এই প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পাদিত হয়। সুতরাং পুঁজিবাদীদের মতে, দাম হল অর্থনীতির ভিত্তি যার উপর এটি দাঁড়িয়ে থাকে এবং তাদের মতে এটি অর্থনীতির স্তম্ভ হিসেবে কাজ করে।

এই হল পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সারমর্ম – যাকে রাজনৈতিক অর্থনীতি বলা হয়। গভীর অধ্যয়নের পর পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নিম্নলিখিত ত্রুটিসমূহ পরিষ্কার হয়ে উঠে:

১. প্রয়োজন ও তা পূরণের উপায়সমূহ মিশ্রিতকরণ

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অর্থনীতি মূলতঃ মানুষের প্রয়োজন ও তা পূরণের উপায় নিয়ে আলোচনা করে। সেকারণে প্রয়োজন পূরণের উপায় হিসেবে **পণ্য ও সেবার উৎপাদন** এবং **পণ্য ও সেবার বন্টন** তাদের দৃষ্টিতে একই বিষয়। প্রয়োজন ও তা পূরণের উপায় পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত ও এমনভাবে অবিচ্ছেদ্য যে একটি আরেকটি মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে বিধায় এগুলো একই বিষয়। ফলে পণ্য ও সেবার উৎপাদনের মধ্যে পণ্য ও সেবার বন্টনবিষয়টি অন্তর্ভুক্ত। এর উপর ভিত্তি করে তারা অর্থনীতিকে একটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে যেখানে অর্থনৈতিক পণ্য ও পণ্যের মালিকানা লাভ করার পদ্ধতিকে কোনরূপ পার্থক্য করা ছাড়া এক করে দেখা হয়। অর্থাৎ অর্থনৈতিক বিজ্ঞান ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা ছাড়া তারা এক করে দেখে। তবে অর্থনৈতিক বিজ্ঞান ও ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বনাম অর্থনৈতিক বিজ্ঞান

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হল তাই যা কীভাবে সম্পদের বন্টন হবে, কীভাবে এরমালিকানা লাভ করা যাবে, কীভাবে ব্যয় ও হস্তান্তর করা হবে তা নির্ধারণকরে। এসব বিষয় নির্ধারণ করা হয় জীবন সম্পর্কে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিবা আদর্শ অনুসরণ করে। সুতরাং ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সমাজতন্ত্র/কম্যুনিজম এবং পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণআলাদা। কারণ এ ব্যবস্থাগুলোর প্রত্যেকটি জীবন সম্পর্কে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে।

অর্থনৈতিক বিজ্ঞান উৎপাদন, এর উনড়বয়ন, উদ্ভাবন ও এর উপকরণের উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করে। অন্যান্য বিজ্ঞানের মত অর্থনৈতিক বিজ্ঞানসব জাতির জন্য সার্বজনীন এবং কোন আদর্শের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পুঁজিবাদে মালিকানার দৃষ্টিভঙ্গি সমাজতন্ত্র/কম্যুনিজম ও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলাদা। তবে উৎপাদন বৃদ্ধি করার আলোচনা একটি পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক ইস্যু এবং জীবনের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সর্ম্পকহীন ও সব লোকের জন্য সমান।

মানুষের প্রয়োজন এবং তা পূরণ করার বিষয় অধ্যয়ন – একটি বিষয়হিসেবে অর্ন্তভুক্তি অর্থাৎ অর্থনৈতিক পণ্য উৎপাদন করা ও তা বন্টনের ধরণকে এক বিষয় ও ইস্যু হিসেবে দেখা ভুল। যার ফলে পুঁজিবাদী অর্থনীতির অধ্যয়নে মিশ্রণ ও বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে। সে কারণে পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভিত্তিই ভুল।

২. মানুষের প্রয়োজন কেবলই বস্তুগত

যেসব প্রয়োজন পূরণ করতে হয় সেগুলো সব কেবলই বস্তুগত – এটি ঠিকনয় এবং প্রয়োজনের বাস্তবতার সাথে সাংঘর্ষিক। বস্তুগত প্রয়োজন ছাড়াওমানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চাহিদা রয়েছে এবং এগুলো পূরণ হওয়াদরকার এবং এগুলোর প্রত্যেকটির পূরণের জন্য পণ্য ও সেবা প্রয়োজন।

৩. পণ্য ও সেবাসমূহ সমাজের কাঠামোর সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়

পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদেরা সমাজ কিরকম হওয়া উচিত সে দিকে দৃষ্টি নাদিয়ে প্রয়োজন ও উপযোগ যেমন সেগুলোকে তেমনভাবেই দেখেছে,অর্থাৎ তারা মানুষকে আধ্যাত্মিক চাহিদা, নীতি চিন্তা বিবর্জিত ও নৈতিকউদ্দেশ্য শূন্য একটি বস্তুগত প্রাণী হিসেবে বিবেচনা করেছে। একইভাবেনৈতিকতার উৎকর্ষতার ভিত্তিতে সমাজ কীভাবে গঠিত হয়,ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে সামাজিক সম্পর্কগুলো কীভাবে নিরূপিত হয়অথবা সমাজে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা অর্থাৎ আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যসব সম্পর্কের পেছনে মানুষের সাথে আল্লাহ্'র সম্পর্ক উপলব্ধিকে চালিকাশক্তি হিসেবে কীভাবে থাকা উচিত সে ব্যাপারে তারা পরোয়া করে না।বস্তুগত চাহিদা পূরণ করার জন্য তার লক্ষ্যও পুরোপুরি বস্তুগত হওয়ায়পুঁজিবাদীরা এসবকে পরোয়া করে না। তার ব্যবসায় যদি লাভ হয় তাহলেসে প্রতারণা করে না, আর প্রতারণা করে যদি লাভ করা যায় তাহলে তারজন্য সেটি বৈধ। স্রষ্টার নির্দেশ মোতাবেক দান করার জন্য সে দরিদ্রমানুষকে খাওয়ায় না, বরং দরিদ্র লোক যাতে তার কাছ থেকে চুরি না করেসে জন্য তাদের খাওয়ায়। যদি দরিদ্র মানুষকে না খাওয়ালে তার সম্পদবৃদ্ধি পায় তবে সে তাই করবে। সুতরাং পুঁজিবাদীদের প্রধান উদ্বেগ হলকেবলমাত্র বস্তুগত প্রয়োজন পূরণ করে যে লাভ – সেদিকে লক্ষ্য রাখা।ব্যক্তি তার নিজের লাভের ভিত্তিতে অন্যের দিকে তাকায় এবং এর ভিত্তিতেঅর্থনৈতিক জীবন প্রতিষ্ঠা করে এবং এরূপ লোক সমাজ ও জনগণের জন্যসবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যক্তি।

এটি হল প্রয়োজন ও উপযোগের আলোকে আলোচনা। সম্পদ ও শ্রমের নিরীখে অর্থাৎ যেগুলোকে পণ্য ও সেবা বলা হয় সেগুলোকে পাওয়ার জন্যব্যক্তি প্রচেষ্টা চালায় যাতে করে উপযোগ পাওয়া যায়। সম্পদ ও শ্রমেরবিনিময়ের কারণে লোকদের মধ্যে সম্পর্কের সৃষ্টি হয় এবং এর উপর ভিত্তিকরে গঠিত হয় সামাজ কাঠামো। সুতরাং সম্পদ ও শ্রমকে মূল্যায়ন করারসময় সমাজের কাঠামো কীরকম হওয়া উচিত তা সাধারণ ও বিস্তারিতউভয়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা অপরিহার্য।সমাজ কীরকম হওয়া উচিত সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে প্রয়োজন পূরণ করারজন্য অর্থনৈতিক পণ্যের দিকে কেবল দৃষ্টি নিবদ্ধ করা অর্থনৈতিক পণ্যকেসমাজ বিচ্ছিনড়ব ও সম্পর্কহীন করার নামান্তর – যা অস্বাভাবিক। এইঅর্থনৈতিক পণ্য লোকদের মধ্যে বিনিময় হয়, ফলে তাদের মধ্যে সম্পর্কসৃষ্টি হয় এবং সমাজ থেকেও সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। সুতরাং অর্থনৈতিক পণ্যকেবিবেচনা করার সময় সমাজের উপর এর প্রভাব উপলব্ধি করা উচিত।কেউ পছন্দ করে বলে একটি পণ্যকে সমাজের উপযোগী বলে বিবেচনাকরা ঠিক নয় – হতে পারে এটি নিজেই ক্ষতিকারক অথবা ক্ষতিকারক নয়,এটি মানুষের মধ্যকার সম্পর্ককে প্রভাবিত করে অথবা করে না, সমাজেরলোকদের বিশ্বাসের ভিত্তিতে এটি অনুমোদিত অথবা নিষিদ্ধ। বরং একটিপণ্যকে তখনই উপযোগী বলা উচিত যখন এর থেকে সমাজ যে রকমহওয়া উচিত তার ভিত্তিতে সত্যিকার অর্থে সমাজ উপকৃত হয়। সুতরাংক্যানাবিস, আফিম ও এজাতীয় তথাকথিত পণ্যকে উপযোগী বিবেচনাকরা ও কেউ এগুলো চায় বলে সেগুলোকে অর্থনৈতিক পণ্য হিসেবেবিবেচনা করা সঠিক হবে না। তার বদলে যখন কোন অর্থনৈতিক পণ্যকেউপযোগী বিবেচনা করা হবে তখন সমাজের লোকদের সম্পর্কের উপর এরপ্রভাব বিবেচনা করতে হবে, অর্থাৎ এর ভিত্তিতে পণ্যটিকে আমরাঅর্থনৈতিক পণ্য হিসেবে বিবেচনা করব অথবা করব না। সমাজ যে রকমহওয়া উচিত এর ভিত্তিতে জিনিসসমূহকে দেখা উচিত। সমাজ কীরকমহওয়া উচিত তা বিবেচনায় না এনে পণ্যটিকে খোলা চোখে যেরকম মনেহয়, সেরকম মনে করা ভুল।

প্রয়োজন পূরণ করার বিষয়টি প্রয়োজন পূরণের উপকরণের মধ্যে অন্তর্ভুক্তকরে এবং অন্য কিছু বিবেচনায় না এনে প্রয়োজন পূরণের উপকরণকেপ্রয়োজন পূরণের একমাত্র অবলম্বন মনে করে অর্থনীতিবিদেরা সম্পদেরবন্টনের চেয়ে সম্পদ সৃষ্টি করার দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করেছে। প্রয়োজনপূরণের জন্য সম্পদ বন্টন করার গুরুত্ব এখানে গৌণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটিই লক্ষ্য এবং সেটি হল সামগ্রিকভাবে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করা এবং এটি সর্বোচ্চ পরিমাণের উৎপাদন অর্জন করার জন্য কাজ করে। এটি বিবেচনা করে যে দেশেউৎপাদন বৃদ্ধি করে জাতীয় আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে এবং উৎপাদন ও মালিকানালাভ করার ক্ষেত্রে স্বাধীন হওয়ায় প্রত্যেক ব্যক্তিকে সম্পদ অর্জন করারজন্য স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিয়ে সমাজের সদস্যদের জন্য সর্বোচ্চ পরিমাণে সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব। সুতরাং ব্যক্তির চাহিদা পূরণ করা বাএকটি সম্প্রদায়ের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজন মেটানো সহজতর করার জন্য অর্থনীতি নয়, বরং যা ব্যক্তির প্রয়োজন মেটায় তা বৃদ্ধির দিকে এটি কেন্দ্রীভূত অর্থাৎ উৎপাদন বৃদ্ধি ও দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে সম্প্রদায়ের প্রয়োজন পূরণ করাই এর লক্ষ্য। মালিকানা লাভ করা ও কাজ করার স্বাধীনতার দ্বারা জাতীয় আয়ের সুপ্রাপ্যতার মাধ্যমে সমাজের সদস্যদের মধ্যে আয়ের বন্টন নিশ্চিত হয়। সম্পদ অর্জন করার ক্ষেত্রে ব্যক্তির উৎপাদনের সামর্থ অনুসারে এটি তার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে –হোক এর মাধ্যমে সব ব্যক্তি কিংবা কেবল কিছু ব্যক্তি সন্তুষ্ট থাকে।

এটি হল রাজনৈতিক অর্থনীতি অর্থাৎ পুঁজিবাদী অর্থনীতি। এটি একটিপ্রকাশ্য ভ্রান্তি এবং বাস্তবতার সাথে সাংঘর্ষিক। এটি সব ব্যক্তির জীবনমান উন্নত করার জন্য কাজ করে না এবং প্রত্যেক ব্যক্তির মৌলিক কল্যাণ নিশ্চিত করে না। এ দৃষ্টিভঙ্গির ভুল দিকটি হল যে, যেসব প্রয়োজনমেটানোর কথা বলা হয় সেগুলো হল ব্যক্তির প্রয়োজন। এগুলো হলমানুষের প্রয়োজন। সুতরাং এগুলো হল মুহাম্মদ, সালিহ ও হাসানের প্রয়োজন, এ প্রয়োজন কোন ব্যক্তি সমষ্টি, কিছু জাতির বা একটি জনসমষ্টির নয়। সুতরাং ব্যক্তি নিজেই তার প্রয়োজন পূরণের জন্য কাজ করবে – হোক সে এটি সরাসরি পূরণ করে, যেমন: খাওয়া দাওয়া অথবাসে পুরো জনসমষ্টির চাহিদা পূরণ করার মাধ্যমে এটি করে থাকে, যেমন:একটি জাতির প্রতিরক্ষা। সুতরাং ব্যক্তিরপ্রয়োজনপূরণের

উপকরণ বন্টনের মধ্যে অর্থনৈতিক সমস্যা নিহিত রয়েছে অর্থাৎজাতির মধ্যে থাকা প্রত্যেক ব্যক্তির কথা বিবেচনা না করে জাতি বা লোকদের যা প্রয়োজন তা পূরণ করার মধ্যে নয়, বরং জাতির সদস্য ও লোকদের কাছে তহবিল ও উপযোগ বন্টন করার মধ্যে। অন্য কথায় সমস্যা হল ব্যক্তির দরিদ্রতা কিন্তু জাতির নয়। প্রত্যেক ব্যক্তির মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল বিষয় হতে হবে, কখনই অর্থনৈতিক পণ্য উৎপাদনের আলোচনা করা নয়।

ফলে জাতীয় উৎপাদনের আকারকে প্রভাবিত করে এমন নিয়ামকসমূহের অধ্যয়ন অবশ্যই প্রত্যেক ব্যক্তির আলাদা আলাদাভাবে ও সম্পূর্ণরূপে সবমৌলিক প্রয়োজন পূরণের অধ্যয়ন থেকে আলাদা। একজন ব্যক্তির সব মৌলিক মানবিক প্রয়োজন পূরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমাজের সদস্যদের মধ্যে সম্পদের বন্টনের আলোচনা অধ্যয়নের বিষয় হতে হবে। এটিই গবেষণার বিষয় হওয়া উচিত এবং প্রম থেকেই এটিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তাছাড়া একটি দেশের দরিদ্রতা বিমোচনের প্রচেষ্টা ব্যক্তিগতভাবে একজন ব্যক্তির দরিদ্রতা নিরসন করে না। বরং ব্যক্তির দরিদ্রতা নিরসনের জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহ এবং পদক্ষেপগুলোর মধ্যে দেশের সম্পদ বন্টনের কর্মসূচী দেশের লোকদের জাতীয় আয় বৃদ্ধি করার জন্য কাজকরতে উদ্বুদ্ধ করে। উৎপাদনের পরিমাণ ও জাতীয় আয় বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে এমন নিয়ামকসমূহের গবেষণা অর্থনৈতিক বিজ্ঞানে আলোচনা করা উচিত অর্থাৎ প্রয়োজন পূরণের আলোচনায় নয় বরং অর্থনেতিক পণ্য এবং এর বৃদ্ধির আলোচনায় এটি স্থান পাবে। কেননা প্রয়োজন পূরণের বিষয়টি অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আলোচিত হবে।

পুঁজিবাদীরা দাবি করে যে কোন একটি সমাজ অর্থনৈতিকভাবে যে সমস্যার সম্মুখীন হয় তা হল পণ্য ও সেবার অভাব। তারা আরও দাবি করে যে,চাহিদা অবিরতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকলেএবং এগুলোকে পূরণ করার অক্ষমতা অর্থাৎ মানুষের সব প্রয়োজনপুরোপুরি পূরণ করার জন্য পণ্য ও সেবার অপর্যাপ্ততাই হল অর্থনৈতিক সমস্যার ভিত্তি। এ দৃষ্টিভঙ্গি ত্রুটিপূর্ণ ও বাস্তবতার সাথে সাংঘর্ষিক। এরকারণ হল একজন মানুষের ব্যক্তি হিসেবে তার মৌলিক প্রয়োজন (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান) পূরণ হতে হবে, কিন্তু বিলাস সামগ্রী নয় – যদিও এগুলোও মানুষ চায়। মানুষের মৌলিক প্রয়োজন সীমিত এবং পৃথিবীতে বর্তমানযেসব সম্পদ ও প্রচেষ্টাকে তারা পণ্য ও সেবা হিসেবে অভিহিত করে থাকেসেসব অবশ্যই সব মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করার জন্য পর্যাপ্ত, মানবজাতির সব মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করা সম্ভব। মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করা নিয়ে কোন সমস্যা নেই যদি না সেটিকে সমাজের জন্য অর্থনৈতিক সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাস্তবে অর্থনৈতিক সমস্যা হল ব্যক্তির সব মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য এইসব সম্পদ ও প্রচেষ্টাসমূহের বন্টন এবং এরপর তাদেরকে বিলাস সামগ্রী অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে সাহায্য করা।

অবিরতভাবে প্রয়োজন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বলা যায় এটি মৌলিক প্রয়োজনবৃদ্ধির সাথে সংশ্লিষ্ট কোন বিষয় নয়। কারণ মানুষ হিসেবে কোন ব্যক্তিরমৌলিক প্রয়োজন বাড়ে না। অন্যদিকে বিলাস সামগ্রীর চাহিদা বাড়ে ওপরিবর্তিত হয়। শহুরে জীবনে উনড়বতির সাথে চাহিদার বৃদ্ধি মৌলিকপ্রয়োজনের সাথে বিজড়িত নয় বরং বিলাস সামগ্রীর সাথে জড়িত। মানুষ বিলাস সামগ্রী অর্জনের জন্য কাজ করে, কিন্তু এগুলো পূরণ না হলে সমস্যার সৃষ্টি হয় না। যা সমস্যার সৃষ্টি করে তা হল মৌলিক অধিকারপূরণ না হওয়া। এসব কিছুর পাশাপাশি বিলাস সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধির প্রশ্নটি কেবলমাত্র কিছু লোকের সাথে জড়িত যারা একটি নির্দিষ্ট দেশে বাসকরে এবং এ প্রশ্নটি দেশের সব ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত নয়। মানুষেরমধ্যে প্রয়োজন পূরণের স্বাভাবিক প্রবণতার মাধ্যমে এ প্রশ্নটির সমাধানহয়। বিলাস সামগ্রী অর্জনের প্রবল আকাঙ্খার ফলে মানুষ তার দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করে, অন্য দেশে কাজ করে অথবা অন্য দেশের সাথে একীভূতকরণ বা প্রসারণের মাধ্যমে এগুলো পূরণের জন্য ধাবিত হয়। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির মৌলিক প্রয়োজন পুরোপুরি পূরণের ইস্যুটির চেয়ে এটি আলাদা। এর কারণ হল প্রত্যেক ব্যক্তির মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করা ও বিলাস সামগ্রীর চাহিদা পূরণ করার জন্য সম্পদ বন্টন করার সমস্যাটি জীবনের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সম্পর্কযুক্ত যা বিশেষ আদর্শ বহনকারী কোন বিশেষ জাতির সাথে সম্পর্কযুক্ত। জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় আয় বৃদ্ধির সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। রাষ্ট্রের সম্পদের যথাযথ ব্যবহার, বিদেশ গমন, রাষ্ট্রের সীমানা বর্ধন অথবা অন্য দেশের সাথে একীভূত হওয়া ইত্যাদি জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি করে। দেশের সম্পদ বৃদ্ধি কোন বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি, আদর্শ বা জাতির সম্পর্কিত নয়, বরং তা বাস্তবভিত্তিক সমাধানের উপর নির্ভরশীল।

সুতরাং এমন অর্থনৈতিক মূলনীতিপ্রণয়ন করতে হবে যেগুলো জাতিরপ্রত্যেক ব্যক্তির জন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণও বাহ্যিক সম্পদের বন্টন নিশ্চিত করবে– যাতে করে প্রত্যেকের মৌলিকপ্রয়োজন পূরণ হয় এবং অতঃপরপ্রত্যেককে বিলাস সামগ্রী অর্জনের জন্যসামর্থ্যবান করে তোলা যায়। তবেউৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রয়োজন এবংঅর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এর আলোচনাঅর্থনৈতিক সমস্যাটির সমাধান করে না– যা হল প্রত্যেক ব্যক্তির চাহিদাপুরোপুরি পূরণ করা। উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি দেশের সম্পদ বৃদ্ধির দিকেনিয়ে যায় কিন্তু কার্যকরভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির মৌলিক চাহিদা পুরোপুরিপূরণ করে না। দেশটি প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হতে পারে, যেমন: ইরাকও সৌদি আরব, কিন্ত তাদের দেশের অধিকাংশ নাগরিকের মৌলিকপ্রয়োজন পূরণ হয়নি। সুতরাং জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি প্রত্যেক ব্যক্তির সবারআগে ও সর্বপ্রম বিবেচনা করতে হয় এমন মৌলিক সমস্যার সমাধানকরে না অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির মৌলিক প্রয়োজন পুরোপুরি পূরণ করা ওঅতঃপর তাদেরকে বিলাস সামগ্রী অর্জনের জন্য সামর্থ্যবান করে তোলার সাথে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির সম্পর্ক নেই। সুতরাং দরিদ্রতা ও বঞ্চনা মানুষ হিসেবে মৌলিক অধিকার পূরণ না হওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে হবে, কিন্তু কখনই নগরায়নের কারণে ক্রমবর্ধমান বিলাস সামগ্রীর চাহিদারকারণে নয়। সুতরাং সমাজের প্রত্যেকের দরিদ্রতা ও বঞ্চনাকেই বঞ্চনাসমস্যা হিসেবে বিবেচনা করতে হবে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে হিসেব করা দেশের দরিদ্রতা বঞ্চনা সমস্যা নয়। প্রত্যেক ব্যক্তির দরিদ্রতা ও বঞ্চনা বিবেচনা করার দৃষ্টিভঙ্গি

ক্রমবর্ধমান জাতীয় আয় বৃদ্ধি দ্বারা নিরূপিত হয়না, বরং এটিকে এমনভাবে বিবেচনা করা হয় যাতে মৌলিক অধিকারপুরোপুরি পূরণ করার জন্য সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে সম্পদ বন্টিত হয় এবং তারপর প্রত্যেককে বিলাস সামগ্রী অর্জনের জন্য সামর্থ্যবান করে তোলা যায়।

পুঁজিবাদ মূল্যকে প্রকৃত নয়, বরং আপেক্ষিক হিসেবে বিবেচনা করে, এবং এটি একটি অনুমানভিত্তিকপরিমাপ হিসেবে পরিগণিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, বাজারে সুপ্রাপ্যতার ভিত্তিতে এক হাত কাপড়ের মূল্য হল তা থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগিতা। এর মূল্য বলতে যে পরিমাণ পণ্য ও সেবা এর জন্য বিনিময় করা যাবে তাও বুঝায়। এক হাত কাপড়ের বিনিময় হিসেবে যদি অর্থ পাওয়া যায় তাহলে তা 'দাম' হিসেবে বিবেচিত হয়। তাদের দৃষ্টিতে এ দু'টি মূল্য স্বতন্ত্র, এবং এগুলোর আলাদা নাম রয়েছে: উপযোগিতা, এবং বিনিময়ের মূল্য। এ সংজ্ঞা অনুসারে মূল্যের এই অর্থ ভুল। কারণ কোন পণ্যের মূল্য হল পণ্যটির দুষ্প্রাপ্যতা সাপেক্ষে ঐ পণ্যের মধ্যে থাকা উপযোগিতার পরিমাণ। সুতরাং একটি পণ্যের জন্য সত্যিকারের দৃষ্টিভঙ্গী হল এর দুষ্প্রাপ্যতাকে বিবেচনা করে এর মধ্যে থাকা উপযোগিতা পর্যবেক্ষণ করা, তা এই পণ্যটি শুরু থেকেই কোন ব্যক্তির মালিকানায় আসুক, যেমন শিকারের মাধ্যমে অথবা বেচাকেনার মাধ্যমেই আসুক অথবা এটি ব্যক্তি সম্পর্কিত হোক অথবা কোন জিনিষ সম্পর্কিত হোক। সুতরাং মূল্য এমন একটি সুনির্ধারিত বিষয়ের নাম যার সুনির্দিষ্ট বাস্তবতা রয়েছে এবং এটি কোন আপেক্ষিক বিষয় নয় যা কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়, অন্যক্ষেত্রে নয়। সুতরাং মূল্য একটি বাস্তব পরিমাপ, আপেক্ষিক নয় সুতরাং পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদদের মূল্য সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গী তা এর ভিত্তি থেকেই ভুল।

প্রান্তিকউপযোগিতাবামূল্য বলতেমূল্যর এমন একটিহিসাববা অনুমানকে বুঝায় যাপণ্যবন্টনের নিকৃষ্টতম পরিস্থিতিতেউৎপাদন পরিচালনারঅভিপ্রায়ে প্রাক্কলিত। ফলত: একটি পণ্যের মূল্য হিসাব করা হয় সর্বনিম্ন সীমার উপর ভিত্তি করে যাতে উৎপাদন সুনিশ্চিতভাবে চলতে থাকে। প্রান্তিক উপযোগিতা একটি পণ্যের প্রকৃত মূল্য নয় অথবা এমনকি পণ্যের দামও নয়। কেননা পণ্যের দুষ্প্রাপ্যতাকে বিবেচনায় এনে হিসাব করার সময় এর মধ্যে থাকা উপযোগিতাই হল এর মূল্য। এর মূল্য কমবে না যখন পরবর্তীতে এর দাম পড়ে যায় এবং বৃদ্ধি পাবে না যদি এর দাম বেড়ে যায়। কারণ মূল্যায়ন করার সময় এর মূল্য বিবেচনা করা হয়েছে। সুতরাং প্রান্তিক উপযোগিতা তত্ত্ব মূল্য সম্পর্কিত কিছু নয়, ববং এটি দামের সাথে সংশ্লিষ্ট। এমনকি পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টিতেও দাম ও মূল্যের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। দামের হিসাবকে যা পরিচালনা করে তা হল চাহিদার প্রাচূর্যতার সাথে সরবরাহের ঘাটতি অথবা সরবরাহের প্রাচূর্যতার সাথে চাহিদার ঘাটতি। এগুলো একটি পণ্যের উৎপাদনের পরিমাণের সাথে সম্পর্কযুক্ত, বন্টনের সাথে নয়। বরং মূল্য, মূল্যায়নের সময় পণ্যের মধ্যে থাকা মোট উপযোগিতারপরিমান যাপণ্যের দুষ্প্রাপ্যতাকে মাথায় রেখে পরিমাপ করা হয় যদিও তা পণ্যের মূল্য নির্ধারণের উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। সুতরাং সরবরাহ ও চাহিদা মূল্যকে প্রভাবিত করে না।

সুতরাং, মূল্যের বিষয়টি এর গোড়া থেকেই ভুল। সে কারণে ভুল ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা যে কোন কিছু ভুল হতে বাধ্য। যদি শ্রমকিংবা অন্যকোন পণ্য হতেপ্রাপ্ত সুবিধা মাপকাঠি হিসেবে ধরে নিয়েপণ্যের মধ্যে উপস্থিত সুবিধাকে পরিমাপ করা হয় তবে সে মূল্যায়নটি সঠিক হবে এবং স্বল্পমেয়াদে অনেক বেশী স্থিতিশীলতা প্রদান করবে। যদি মূল্য দামের ভিত্তিতে পরিমাপ করা হয় তাহলে মূল্যায়ন প্রকৃত হবে না, আপেক্ষিক হবে। এবং বাজার অনুসারে এটি সর্বদা পরিবর্তিত হতে থাকবে। এক্ষেত্রে এটিকে মূল্য হিসেবে বিবেচনা করা সঠিক হবে না বিধায় মূল্য শব্দটি এক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সমীচীন নয়। কারণ সেক্ষেত্রে এটি পণ্যের গুণাগুণ অনুযায়ী নয় বরং বাজার অনুযায়ী টাকা কামানোরমাধ্যমে পরিণত হবে।

পুঁজিবাদীরা বলে মানুষ যে শ্রম ব্যয় করে তার ফলাফল হিসেবে উপযোগ পাওয়া যায়। সুতরাং পুরষ্কার যদি কাজের অনুরূপ না হয় তাহলে নিঃসন্দেহে উৎপাদন নিম্নমুখী হবে এবং তারা এটি থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, সমাজের সদস্যদের মধ্যে সম্পদ বন্টনের আদর্শিক পদ্ধতি হল তাই যা সর্বোচ্চ পরিমাণের উৎপাদনকে সুনিশ্চিত করে। এ পদ্ধতি পুরোপুরি ভুল। কেননা বাস্তবে যেসব সম্পদ স্রষ্টা সৃষ্টি করেছেন সেগুলোই পণ্যের মধ্যে থাকা উপযোগের ভিত্তি। এবং এসব সম্পদের উপযোগিতা বৃদ্ধির জন্য ব্যয়কৃত খরচ অথবা নতুন একটি উপযোগের সুত্রপাত করতে এর সাথে যোগকৃত শ্রম একটি বিশেষ উপযোগের যোগান দেয়।সুতরাং উপযোগকে কেবলমাত্র শ্রমের ফলাফল হিসেবে বিবেচনা করা পুরোপুরি ভুল। কেননা এটি কাঁচামাল ও অন্যান্য ব্যয়কে উপেক্ষাকরে। কিছুক্ষেত্রে এ খরচ কাঁচামালের জন্য ক্ষতিপূরণস্বরূপ, কোনভাবেই শ্রমের জন্য নয়। সুতরাং উপযোগ মানুষের শ্রমের ফলাফল হিসেবে আসতে পারে অথবা কাঁচামালের জন্যও আসতে পারে অথবা উভয়ের ফলাফল হিসেবে আসতে পারে, কিন্তু কেবলমাত্র মানুষের শ্রমের ফলাফল হিসেবে নয়।

কেবলমাত্র কাজের পুরষ্কার হ্রাস পেলেই উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পায় না, বরং দেশ থেকে সম্পদ ক্রমাগত উজাড় হতে থাকলে, যুদ্ধ বা অন্য কোন কারণে উৎপাদন হ্রাস পেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বৃটেন ও ফ্রান্সের উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার কারণ কাজের পুরষ্কার কমে যাওয়ায় নয়, বরং ঐশ্বর্যপূর্ণ উপনিবেশগুলোর উপর তাদের প্রভাব সংকুচিত হওয়ায় এবং যুদ্ধে তাদের অংশগ্রহণের কারণে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার কারণ কাজের পুরষ্কার কমে যাওয়ায় নয়, বরং জার্মানীর সাথে তাদের যুদ্ধের কারণে। ইসলামী বিশ্বে আজকে উৎপাদনের যে হ্রাস ঘটেছে সেটিও কাজের পুরষ্কার কমে যাওয়ায় নয় বরং বুদ্ধিবৃত্তিক অধঃপতনের কারণে যাতে গোটা উম্মাহ্ নিপতিত। সুতরাং কাজের পুরষ্কার পাওয়ার ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ততাই উৎপাদন হ্রাসের একমাত্র কারণ নয় এবং এই ভিত্তিতে চিন্তা করাও ভুল যে, বন্টনের আদর্শিক পদ্ধতি হল উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। উৎপাদনের সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্জনের সাথে প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে সম্পদ বন্টনের কোন সম্পর্ক নেই।

পুঁজিবাদীরা বলে দাম উৎপাদনের প্রণোদনা হিসেবে কাজ করে এবং একজন ব্যক্তির শ্রম ব্যয় করার লক্ষ্যই হল বস্তুগতভাবে পুরষ্কৃত হওয়া। এ দৃষ্টিভঙ্গী ভুল এবং বাস্তবতার সাথে সাংঘর্ষিক। মানুষ অনেক সময় নৈতিক পুরষ্কার পাওয়ার জন্য শ্রম ব্যয় করে, যেমন স্রষ্টার কাছ থেকে পুরষ্কার পাওয়ার জন্য অথবা কোন নৈতিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য, যেমন: কারও অনুগ্রহ ফিরিয়ে দেয়া। মানুষের চাহিদা বস্তুগত হতে পারে, যেমন: বস্তুগত লাভ; এটি আধ্যাত্মিকও হতে পারে, যেমন: মুক্তি লাভ করা; অথবা নৈতিক, যেমন:প্রশংসা অর্জন করা। সুতরাং কেবলমাত্র বস্তুগত চাহিদাকে বিবেচনা করা ভুল। বাস্তবে একজন ব্যক্তি তার বস্তুগত চাহিদা পূরণের চেয়ে আধ্যাত্মিক বা নৈতিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে অনেক উদারভাবে ব্যয় করতে পারে। সুতরাং দামই উৎপাদনের একমাত্র প্রণোদনা নয়। একজন রাজমিস্ত্রী মাসের পর মাস পাথর কেটে মসজিদ বানানোর জন্য আত্মনিয়োগ করতে পারে, একটি কারখানা কিছুদিনের উৎপাদন দরিদ্রদের মধ্যে বন্টনের জন্য বরাদ্দ করতে পারে এবং একটি জাতি কিছু অথবা সব প্রচেষ্টা তার ভূমিকে সুরক্ষার জন্য ব্যয় করতে পারে। এ ধরনের উৎপাদন দাম দ্বারা প্রণোদিত নয়। তাছাড়া বস্তুগত পুরষ্কার কেবলমাত্র দামের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটি অন্য পণ্য ও সেবার মাধ্যমেও আসতে পারে। সুতরাং দামকে উৎপাদনের একমাত্র প্রণোদনা বিবেচনা করা ভুল।

পুঁজিবাদের একটি বড় অনিয়ম হল দামকে সমাজের লোকদের মধ্যে সম্পদ বন্টনের জন্য একমাত্র নিয়ন্ত্রক হিসেবে বিবেচনা করা। তারা বলে দাম হল একমাত্র প্রতিবন্ধকতা যা ভোক্তাকে তার আয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কোন কিছুর মালিকানা লাভ ও সে অনুসারে ব্যয় করতে বাধ্য করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার আয় যতটুকু অনুমোদন করে ঠিক ততটুকুর মধ্যে ব্যয়কে সীমিত রাখে। একইভাবে কিছু পণ্যের দাম বৃদ্ধি ও অন্য কিছুর দাম হ্রাসের মাধ্যমে এবং কিছু লোকের হাতে অর্থের সুলভতা ও অন্য কিছু লোকের হাতে এর দুষ্প্রাপ্যতার কারণে দাম ভোক্তাদের মধ্যে সম্পদের বন্টনকে নিয়ন্ত্রন করে। সুতরাং দেশের প্রত্যেক ব্যক্তি যে পরিমাণ সম্পদের অংশীদার হয় তা তার মৌলিক চাহিদার সমপরিমাণ নয়, বরং পণ্য বা সেবা উৎপাদনের ক্ষেত্রে তার যতটুকু অবদান রয়েছে অর্থাৎ ভূমি বা মূলধনের ক্ষেত্রে সে যতটুকুর মালিক সে পরিমাণ অথবা সে কাজের বা প্রজেক্টের যতটুকু করেছে সে পরিমাণ।

এ মূলনীতি থেকে অর্থাৎ দাম বন্টনের নিয়ন্ত্রক থেকে বলা যায় যে, পুঁজিবাদ কার্যকরভাবেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, মানুষ একটি সুন্দর জীবন পাবে না যদি সে পণ্য ও সেবা উৎপাদনে অবদান রাখতে সামর্থ্যবান না হতে পারে। যে ব্যক্তি অবদান রাখতে অক্ষম অর্থাৎ সে যদি জন্মসূত্রে শারীরিক বা মানসিকভাবে অক্ষম থাকে তাহলে সে জীবন পাওয়ার যোগ্যতা রাখে না এবং তার চাহিদা পূরণের জন্য সম্পদ নেয়ার ক্ষেত্রেও তার যোগ্যতা নেই। তাছাড়া যে শারীরিক ও মানসিকভাবে শক্তিশালী হয়ে জন্ম লাভ করেছে এবং সে তার ইচ্ছেমত সম্পদ সৃষ্টি ও মালিকানা লাভ করতে সমর্থ্য। এ ধরনের লোক বিলাসী জীবনযাপনের মাধ্যমে খরচ করার যোগ্য এবং তার সম্পদ দ্বারা অন্যদের উপর নিয়ন্ত্রন ও প্রভূত্ব করার যোগ্যতা রাখে। তাছাড়া বস্তুগত লাভ খোঁজার ক্ষেত্রে যে ব্যক্তির প্রণোদনা বেশী সে ব্যক্তি সম্পদের মালিকানা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যদের ছাড়িয়ে যাবে, আর অন্যদিকে যার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি (উপার্জনের সময় যেগুলো তাকে নিয়ন্ত্রন করে) জোঁক বেশী শক্তিশালী তার মালিকানা অর্জন বা সম্পদ অর্জন অন্যদের তুলনায় কম হবে। এ প্রক্রিয়া জীবন থেকে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক নিয়ামকসমূহকে বাদ দিয়েছে এবং বস্তুগত চাহিদা পূরণের বিভিন্ন উপায় অনুসন্ধানে লালায়িত বস্তুগত সংগ্রামের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এক জীবন তৈরি করেছে। পুঁজিবাদ প্রয়োগকারী প্রতিটি দেশে ক্রমাগত এটাই ঘটেছে। যেসব দেশ পুঁজিবাদকে গ্রহণ করেছে সেসব দেশে ভোক্তাকে নিয়ন্ত্রন করে এমন উৎপাদক পুঁজিপতিদের একচেটিয়া আধিপত্য গড়ে উঠেছে। জনগণের ছোট্ট একটি অংশ, বড় তেল কোম্পানী, স্বয়ংক্রিয় যান, ভারী শিল্প করপোরেশনের মালিক হওয়ায় তারা যা উৎপাদন করে সেসবের উপর যথেচ্ছভাবে একটি দাম বসিয়ে তারা ভোক্তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। যা পরববর্তীতে একটি জোড়াতালি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দিকে তাদের ধাবিত করে। জাতীয় অর্থনীতিকে রক্ষা, ভোক্তাদের রক্ষা এবং কিছু পণ্যের ব্যবহারকে হ্রাস করা এবং একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের কর্তৃত্ব সীমিত করার জন্য রাষ্ট্রকে বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে দাম নির্ধারণ করে দেয়ার ক্ষমতা দিয়ে তারা এটি করে থাকে। সরকার পরিচালিত কিছু গণ প্রকল্পকেও তারা এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। এসব হস্তক্ষেপ তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার (অর্থনৈতিক স্বাধীনতা) সাথে সাংঘর্ষিক এবং এগুলো কেবলমাত্র বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। অনেক (রক্ষণশীল) পুঁজিবাদী এ হস্তক্ষেপ নীতি গ্রহণ করে না এবং তারা একে প্রশ্নবিদ্ধ করে ও প্রচার করে যে, সরকারি কোন হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে দামের কলাকৌশলই কেবল উৎপাদক ও ভোক্তার স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য আনতে যথেষ্ট। হস্তক্ষেপের সমর্থকরা (উদারপন্থীরা) এ ধরনের জোড়াতালি দেয়া সমাধানের ব্যাপারে সুপারিশ করেছে যা বিশেষ পরিস্থিতিতে ও অবস্থাতে প্রয়োগ করা হয়। এমনকি এসব পরিস্থিতিতেও প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে সম্পদের বন্টন প্রত্যেকের সব মৌলিক চাহিদাকে পরিপূর্ণভাবে পূরণ করতে পারে না।

মালিকানার স্বাধীনতার ধারণা এবং দামকে সম্পদ বন্টনের একমাত্র কলাকৌশল হিসেবে বিবেচনা করার ধারণার কারণে পণ্য ও সেবার খারাপ বন্টন হয় এবং এ চিত্র পুঁজিবাদ প্রয়োগ হয় এমন সব সমাজে আধিপত্য বিস্তার করে। আমেরিকান সমাজের ক্ষেত্রে অনেক আমেরিকানদের তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও এমনকি বিলাস সামগ্রী অর্জনের জন্য দেশের সম্পদে যথেষ্ট শেয়ার রয়েছে। এ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে সে দেশের ব্যাপক সম্পদের কারণে, যা সেদেশের প্রত্যেক ব্যক্তির মৌলিক অধিকার ও বিলাসী সামগ্রী অর্জনের সুযোগ করে দিয়েছে। তবে এটি একজন ব্যক্তি উৎপাদনে যতটুকু শ্রম দিতে পারছে তার মূল্যের সমপরিমাণ শেয়ারের কারণে হচ্ছে এরূপ বলা যাবে না। তাছাড়া দামের কৌশলকে বন্টনের নিয়ন্ত্রক হিসেবে নির্ধারণের কারণে পশ্চিমা পুঁজিপতি একচেটিয়া ব্যবসায়ীরা অন্য দেশের নতুন বাজার খুঁজতে প্রণোদিত হয়, যেখান থেকে তারা কাঁচামাল সংগ্রহ করে ও উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করে। উপনিবেশবাদ, আঞ্চলিক কর্তৃত্ব, অর্থনৈতিক দখলদারিত্ব থেকে উদ্ভুত সমস্যাগুলো একচেটিয়া ব্যবসা ও সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে দামকে

উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করার কারণে সৃষ্টি হয়েছে। এ ভিত্তিতেই পৃথিবীর সম্পদ পুঁজিপতি একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের হাতে পুঞ্জীভূত হয়েছে। পুঁজিবাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এসব ভুল নিয়ম-নীতির কারণে তা সম্ভব হয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যেখানে কমিউনিজম এর একটি অংশ, এটি পুঁজিবাদের সাথে সাংঘর্ষিক। এর বৈশ্বিক ও আভ্যন্তরীণ প্রয়োগকারী সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের সাথে সাথে আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে এর প্রভাব বিদায় হলেও ইসলামের দাওয়াহ্ প্রচারকারীগণের জন্য এই চিন্তাকে খন্ডন এবং এর ত্রুটিগুলোকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরার জন্য এই বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান রাখা অত্যাবশ্যক। কারণ সামগ্রিক কিংবা আংশিকভাবে হোক, গুটিকয়েক গোষ্ঠীর মধ্যে এই চিন্তাগুলো এখনও আলোচিত হয়।

উনিশ শতকের দিকে অধিকাংশ সমাজতান্ত্রিক চিন্তার জন্ম হয়। উদারপন্থী মতবাদ অর্থাৎ পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিকদের কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছে। পুঁজিবাদের অধীনে সমাজে যে অসমতা বিরাজ করছিল এবং পাশাপাশি এর ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতার কারণে সমাজতন্ত্রের শক্তিশালী উত্থান ঘটেছিল। সমাজতান্ত্রিক মতবাদ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, তারা তিনটি বিষয়ে একমত পোষণ করে যা তাদেরকে অন্য অর্থনৈতিক মতবাদ থেকে আলাদা করেছে ঃ

১. একধরনের প্রকৃত সমতা অর্জন করা
২. পুরোপুরি কিংবা আংশিকভাবে ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পত্তি বিলুপ্ত করা
৩. সব লোকের মাধ্যমে পণ্য ও সেবার উৎপাদন ও বন্টন সম্পন্ন করা

এ তিনটি বিষয়ে তাদের ঐকমত্য থাকলেও বহু বিষয়ে তাদের মধ্যে মৌলিক মতপার্থক্য বিদ্যমান, যাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষায় গুরুত্বপূর্ণগুলো হলো ঃ

প্রথমত ঃ সমাজতান্ত্রিক মতবাদীরা চুড়ান্ড সমতা অর্জনের রুপরেখার ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করে। এক দল পাটিগাণিতিক সমতার পক্ষে কথা বলে অর্থাৎ সবাই সবক্ষেত্রে সমান সুবিধা পাবে; সুতরাং প্রতিটি ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দেয়া হবে। অন্য দল সাধারণ সমতার কথা বলে অর্থাৎ কাজের বন্টনের ক্ষেত্রে সক্ষমতা পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং উৎপাদিত পণ্য বন্টনের সময় প্রত্যেক ব্যক্তির চাহিদার দিকে নজর দিতে হবে। তাদের মতে নিম্নোক্ত মূলনীতিটি প্রয়োগ হলেই কেবল সমতা বাস্তবায়িত হয়েছে বলে ধরে নেয়া হবেঃ "সামর্থ্য অনুযায়ী প্রত্যেকের কাছ থেকে অর্থাৎ তার সক্ষমতা অনুযায়ী (এর অর্থ হচ্ছে সে যতটুকু কাজ সম্পাদন করে), এবং চাহিদানুযায়ী প্রত্যেককে (উৎপাদিত পণ্যের বন্টনকে বুঝায়)।" তৃতীয় দল সবার চাহিদা পূরণের জন্য সম্পদ পর্যাপ্ত না হওয়ায় উৎপাদনের ভিত্তিতে সমতাকে গ্রহণ করছে। ফলে তাদের মতে বন্টনের ভিত্তি হচ্ছে ঃ "সামর্থ্য অনুযায়ী অর্থাৎ সক্ষমতা অনুযায়ী প্রত্যেকের কাছ থেকে এবং কাজ অনুযায়ী প্রত্যেককে।" সুতরাং তাদের মতে সমতা তখনই অর্জন হবে যখন প্রত্যেক ব্যক্তিই অন্য সক্ষম ব্যক্তির মতো উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে।

দ্বিতীয়ত ঃ সমাজতান্ত্রিক মতবাদের প্রবক্তাগণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলুপ্তির রূপরেখা নিয়ে মতভেদ পোষণ করে। একগোষ্ঠী ব্যক্তিগত সম্পত্তি পুরোপুরি বিলুপ্তির পক্ষের মতকে গ্রহণ করেছে, যা মুলতঃ কমিউনিজম। অন্যরা যেসব ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পত্তি উৎপাদনের হাতিয়ার অর্থাৎ মুলধন জাতীয়, যেমন-কলকারখানা, রেল, খনি এবং এ জাতীয় সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত, তা বিলুপ্তির পক্ষে মত দিয়েছে। সুতরাং তারা উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় এমন পণ্যের মালিকানাকে নিষিদ্ধ করেছে। তাই কেউ ভাড়া দেয়ার উদ্দেশ্যে একটি বাড়ি, কারখানা কিংবা এক খন্ড জমির মালিক হতে পারবে না কিন্তু ভোগের জন্য কিছু নির্দিষ্ট ধরনের সম্পত্তিকে তার মালিকানাধীন রাখতে পারবে। সুতরাং তাদের মতে ভোগের নিমিত্তে যেকোন ধরনের পণ্যের অর্জনই বৈধ, যেমন: বসবাসের জন্য বাড়ী, কিন্তু ভূমি ও কারখানা নয়, বরং এগুলো যা উৎপাদন করে সেগুলোর মালিক হতে পারবে। এটিকে বলা হয় মূলধনের সমাজতন্ত্রায়ন। অন্য একটি দল কৃষি জমির সাথে সংশ্লিষ্ট কোন কিছু বাদে অন্য কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধন না করার পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে এবং এদেরকে কৃষিভিত্তিক সমাজতান্ত্রিক (কৃষিভিত্তিক সংস্কারক) বলা হয়। তারপরও আরেক গোষ্ঠীর মতে, জনস্বার্থ যেসব ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে গণমালিকানাধীন সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করতে চায় এমন প্রতিটি বিষয়বস্তুকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে হবে। তাই তারা সুদ ও ভাড়ার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সীমা, এবং পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন সীমা সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বহু জায়গায় নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিমালিকানার কথা বলে থাকে এবং শ্রমিককে মূলধনের একজন অংশীদার বানানোর প্রতি জোর দেয়। এটাকেই রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র বলা হয়।

তৃতীয়ত ঃ সমাজতান্ত্রিক মতবাদ তাদের লক্ষ্য বাস্তবায়নের উপকরণের ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করে। সেকারণে বিপ্লবী সমাজতন্ত্র (Revolutionary Syndicalism) শ্রমিকদের প্রত্যক্ষ আন্দোলন, যেমন: অসহযোগ ধর্মঘট, যন্ত্রপাতি নষ্টের নাশকতামূলক কর্মকান্ড, শ্রমিকদেরকে সাধারণ ধর্মঘটে উদ্বুদ্ধ করা, অর্থাৎ শ্রমিকের নিজস্ব শক্তিবলে অর্জিত শ্রমিক মুক্তি তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল। তাই তারা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে পঙ্গু করার মাধ্যমে বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে সাধারণ ধর্মঘট ডাক দেয়ার সুযোগ আসা পর্যন্ত এই চিন্তার ভিত্তিতে শ্রমিদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য তাদের সকল কর্মসূচীগুলো পরিচালনা করে।

মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিকেরা সমাজ বিবর্তনের প্রাকৃতিক নিয়মে বিশ্বাসী এবং তারা মনে করে বর্তমান ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার জন্য এটাই যথেষ্ট, এবং যা সমাজতন্ত্রের তত্ত্বানুযায়ী অন্য একটি ব্যবস্থা দ্বারা এমনিতেই প্রতিস্থাপিত হবে।

রাষ্ট্রীয় (সরকার) সমাজতন্ত্রের প্রবক্তাগণ মনে করে তাদের চিন্তা বাস্তবায়নের উপায় হল আইন প্রণয়ন। আইন প্রণয়নের মাধ্যমে তারা জনস্বার্থ সংরক্ষণ এবং শ্রমিক শক্তির অবস্থা উন্নয়নের জন্য কাজ করে। পাশাপাশি কর আরোপ, বিশেষ করে মূলধন ও উত্তরাধিকারের সম্পত্তির উপর কর আরোপ করে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মধ্যে বৈষম্য দূর করতে কাজ করে।

চতুর্থত ঃ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রজেক্ট পরিচালনায় প্রশাসনিক কর্মকান্ডের কাঠামোর ব্যাপারেও সমাজতান্ত্রিকেরা দ্বিধাবিভক্ত। যেমন, মূলধনী সমাজতান্ত্রিকেরা উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থাপনাকে সরকারের নিয়ন্ত্রনে রাখতে চায়, অন্যদিকে বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিকেরা এই ব্যবস্থাপনাকে শ্রমিক সংগঠনগুলোর কর্তাব্যক্তিদের নেতৃত্বে (Guild Socialism) গঠিত পরিচালনা পর্ষদের কাছে রাখতে চায়।

সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বসমূহের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ও বিখ্যাত হল জার্মানীর কার্ল মার্কসের তত্ত্ব। তার তত্ত্ব সমাজতান্ত্রিক দুনিয়াকে নিয়ন্ত্রন করেছে এবং এর উপর ভিত্তি করে রাশিয়াতে কমিউনিস্ট পার্টি এবং ইউনিয়ন অব সোভিয়েত সোস্যালিস্ট রিপাবলিক (USSR) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যা দুই দশক আগে তা ধ্বংসের আগ পর্যন্ত ৭০বৎসর টিকে ছিল।

কার্ল মার্কসের অন্যতম সুপরিচিত তত্ত্বসমূহের মধ্যে একটি হল মূল্য তত্ত্ব, যা সে পুঁজিবাদী চিন্তাবিদদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিল এবং এর ভিত্তিতেই সে পুঁজিবাদকে আক্রমণ করেছিল। অ্যাডাম স্মিথকে ইংল্যান্ডের উদার মতবাদের গুরু হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং মনে করা হয় সেই রাজনৈতিক অর্থনীতি অর্থাৎ পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভিত্তির রচয়িতা; মূল্যকে সংজ্ঞায়িত করে সে বলেছে, 'একটি পণ্যের মূল্য তা উৎপাদনে ব্যয়িত শ্রম পরিমাণের উপর নির্ভরশীল।' সুতরাং যে পণ্যটি উৎপাদনে দুই ঘন্টা সময় লাগে তার মূল্য যে পণ্যের উৎপাদনে এক ঘন্টা লাগে তার মূল্যের চেয়ে দ্বিগুন। কাজের তত্ত্বের ব্যাখ্যায় মূল্যকে সংজ্ঞায়িত করে অ্যাডাম স্মিথের পরবর্তী প্রবক্তা রিকার্ডোর মতে, 'শুধু পণ্য উৎপাদনে ব্যয়িত শ্রম পরিমাণই পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করেনা বরং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও উপকরণ তৈরিতে যে পরিমাণ শ্রম ব্যয় হয়েছে তাও বিবেচনায় রাখতে হবে।' অর্থাৎ, রিকার্ডো পণ্যের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যয়িত সকল শ্রমের ভিত্তিতে মূল্য নির্ধারণে বিশ্বাসী। সে এই সমস্ত ব্যয়কে একটি বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছে, আর তা হলো কাজ।

অতঃপর কার্ল মার্কস রিকার্ডোর পুঁজিবাদে ব্যবহৃত মূল্যের তত্ত্বকে ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পত্তি এবং সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদী চিন্তাকে আক্রমণের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। তার মতে, পণ্য উৎপাদনে ব্যয়িত সকল শ্রমশক্তি হচ্ছে পণ্যের মূল নির্ধারণের একমাত্র উৎস, এবং পুঁজিপতি অর্থলগ্নিকারীরা শ্রমিকের শ্রমশক্তিকে এমন পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কিনে নেয় যা কোনরকমে শ্রমিককে বাঁচিয়ে রাখা এবং কাজ অব্যাহত রাখার পরিমাণের চেয়ে বেশী নয়। অতঃপর পুঁজিপতিরা পণ্য উৎপাদনের শ্রমিকের শ্রম শুষে নেয়, যার মূল্য তাকে দেয়া পারিশ্রমিকের চেয়ে বহুগুণে বেশী। কার্ল মার্কস এই পার্থক্যকে অর্থাৎ শ্রমিক যে শ্রমমূল্য দেয় এবং বিনিময়ে তাকে যে পারিশ্রমিক দেয়া হয়, তার পার্থক্যকে 'উদ্বৃত্ত মূল্য' (surplus value) হিসেবে অভিহিত করেছে। রাজস্ব, লাভ বা মূলধন অনুপাতে ফেরতপ্রাপ্ত অর্থ, ইত্যাদির নামে জমিদার এবং ব্যবসায়ীরা যে পরিমাণ অধিকার হরণ করে, তাকে সে এই উদ্বৃত্ত মূল্য হিসেবে আখ্যা দিয়েছে এবং অবৈধ বলেছে।

কার্ল মার্কসের মতে পূর্বের সমাজতান্ত্রিকরা মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচারের প্রতি ভালবাসা ও নির্যাতিতদের পাশে দাঁড়ানোর স্বভাবজাত প্রকৃতি বিদ্যমান থাকার কারণে তাদের তত্ত্বগুলোর সফলতার ব্যাপারে আশাবাদী ছিল। এই মতবাদের প্রবক্তারা সমাজের উপর প্রয়োগ করার জন্য এমন কিছু নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করত যেগুলোতে তারা বিশ্বাসস্থাপন করত এবং তারা এগুলোকে গভর্ণর, ব্যবসায়ী, চিন্তাশীল মানুষদের নিকট উপস্থাপন করত এবং তাদেরকে এ চিন্তাগুলো বাস্তবায়নের জন্য আহ্বান জানাত। কার্ল মার্কস এই চিন্তার ভিত্তিতে তার মতবাদকে তৈরি করেনি অথবা এই প্রক্রিয়াকেও অনুসরণ করেনি। সে তার মতবাদকে যে দার্শনিক তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গড়ে তুলেছিল তা ঐতিহাসিক বিবর্তনবাদ তত্ত্ব নামে পরিচিত, যাকে দ্বান্দিক তত্ত্বও বলা হয়। তার মতে কোনো ব্যবস্থাপক, আইনপ্রণেতা কিংবা সংস্কারকের হস্তক্ষেপ ছাড়াই অর্থনৈতিক নিয়মের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সমাজে বিবর্তনের নিয়মের ফলস্বরূপ সমাজে নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। কার্ল মার্কস এ ধরনের সমাজতন্ত্রকে 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' হিসেবে অভিহিত করে যাতে তার আগে যেসব সমাজতান্ত্রিক মতবাদ এসেছে সেগুলো থেকে এটিকে আলাদা করা যায়। তার আগে আসা সমাজতান্ত্রিক মতবাদসমূহকে 'ইউটোপিয়ান সমাজতন্ত্র' বলা হত। কার্ল মার্কসের সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বের চুম্বকাংশ নিম্নরূপঃ

যে কোন যুগের সমাজের ব্যবস্থার স্বরূপ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অনুযায়ী গঠিত হয়। সমাজব্যবস্থা বিবর্তনের উপর ভুমিকা রাখে বস্তুগত অবস্থার উন্নতির জন্য চলমান শ্রেণী সংগ্রাম। ইতিহাস স্বাক্ষ্য দেয় যে, সংখ্যালঘিষ্ঠ ধনবান শ্রেনীর উপর সর্বাধিক খারাপ অবস্থায় থাকা সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীর বিজয়ের মাধ্যমে এ সংগ্রামের সমাপ্তি হয়েছে। সে এটিকে সামাজিক বিবর্তন হিসেবে অভিহিত করেছে। তার মতে অতীতের মত এ তত্ত্ব ভবিষ্যতেও প্রয়োগযোগ্য। পূর্বে এ সংগ্রাম ছিল মুক্ত মানুষ ও দাসদের মধ্যে, অতঃপর অভিজাত শ্রেণী ও প্রজাদের মধ্যে, এরও পরে অভিজাত শ্রেণী ও কৃষকের মধ্যে এবং নেতা ও দলের প্রধানদের মধ্যে। এ সংগ্রাম সর্বদা স্বল্পসংখ্যক নির্যাতনকারী শ্রেণীর উপর সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্যাতিত শ্রেণীর বিজয়ের মাধ্যমে শেষ হয়েছে। কিন্তু বিজয়ের পর নির্যাতিত শ্রেণী রক্ষণশীল নির্যাতনকারীতে পরিণত হয়। ফরাসি বিপ্লবের পর থেকে এ সংগ্রাম ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণী (Bourgeoisie) ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে। প্রথম শ্রেণী বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রকল্পের প্রভূতে, মূলধনের মালিকে পরিণত হল এবং রক্ষণশীল হয়ে উঠল। সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও শ্রমিক শ্রেণী মূলধনের কিছুই পেত না। ফলত এ অবস্থা দু'টি শ্রেণীর মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দে পরিণত হল যার উৎস হল অর্থনৈতিক কারণ।

আজকের দিনের উৎপাদনের রীতি মালিকানার ব্যবস্থানুযায়ী আবর্তিত হয় না। উৎপাদন আজকাল আর ব্যক্তিতান্ত্রিক নয়; অর্থাৎ আগের মত কেবল ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত হয় না, বরং সামষ্টিক হয়েছে অর্থাৎ কিছু সংখ্যক ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। যাই হোক, একই সময়ে মালিকানার ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়নি। সুতরাং ব্যক্তিগত মালিকানা অব্যাহত আছে এবং তা বর্তমান সমাজের ভিত্তি। একারণে উৎপাদনে অংশগ্রহণকারী শ্রমিক শ্রেণীর মূলধনে কোন অংশ থাকে না। বিধায় তারা প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে না এমন পুঁজিপতিদের করুণার উপর নির্ভর করে। পুঁজিপতিরা শ্রমিক শক্তিকে যৎসামান্য পারিশ্রমিক দিয়ে তাদের শোষণ করে এবং শ্রমিকেরাও এটি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়, কেননা তাদেরকে এ পরিশ্রমের বিনিময়ে অস্তিত্ব রক্ষা করতে হয়। উৎপাদিত পণ্যের মূল্য ও শ্রমিকের পারিশ্রমিকের মধ্যকার পার্থক্য যাকে কার্ল মার্কস 'উদ্বৃত্ত মূল্য' বা 'surplus value' হিসেবে অভিহিত করেছে। এটি পুঁজিপতি একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের কাছে লাভ এবং এখানে ন্যায় বিচার হলে তা শ্রমিকদের অংশ হওয়া উচিত ছিল।

সুতরাং এ দু'টি শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ অব্যাহত থাকে যতক্ষণ না মালিকানার ব্যবস্থা উৎপাদনের ব্যবস্থার সাথে একইরকম না হয় অর্থাৎ যতক্ষণ না মালিকানা সমাজতান্ত্রিক বা সামষ্টিক না হয়। সমাজের বিবর্তনের সূত্র অনুসারে এ সংগ্রাম শ্রমিক শ্রেণীর বিজয়ের মাধ্যমে শেষ হবে। কেননা তারা হল নিপীড়িত ও সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী।

শ্রমিক শ্রেণী যে প্রক্রিয়ায় সাফল্য লাভ করবে এবং যে বিষয়টি এই সাফল্যের কারণ তা হল সমাজের বিবর্তন তত্ত্ব। অর্থনৈতিক জীবনের বর্তমান ব্যবস্থাই ভবিষ্যৎ সম্প্রদায়ের বীজ নিজের মধ্যে বহন করে এবং বর্তমান ব্যবস্থা যে তত্ত্ব দ্বারা পরিচালিত সে কারণেই তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এমন একটি সময় ছিল যখন মধ্যবিত্তরা অভিজাতদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়ী হয়েছিল এবং অর্থনৈতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, কেননা তারা মূলধনের মালিক ছিল। তবে এর ভূমিকা শেষ হয়েছে এবং সময় এসেছে এর অবস্থান পরিত্যাগ করে তা শ্রমিক শ্রেণীর কাছে অর্পণ করার। কেন্দ্রীভূত করার তত্ত্ব ও মুক্ত প্রতিযোগিতার পদ্ধতি তাকে তা করতে বাধ্য করে। কেন্দ্রীভূতকরণের তত্ত্বের প্রভাবে পুঁজিপতিরা সংখ্যায় বিলীন হতে থাকে এবং শ্রমিক শ্রেণী সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুক্ত প্রতিযোগীতার প্রভাবে উৎপাদন সব সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে এবং এর পরিমাণ এমন মাত্রা ছাড়িয়ে যায় যে, শ্রমিক শ্রেণীর ভোক্তারা তাদের নিম্ন মাত্রার পারিশ্রমিক দ্বারা তা ক্রয় করতে অক্ষম। এটি এমন একটি সংকট সৃষ্টি করে যে, কিছু মালিক পুঁজি হারিয়ে শ্রমবাজারে প্রবেশ করে। এ ব্যবস্থা যখন এগুতে থাকে তখন সঙ্কট আরও ঘনীভূত হয় এবং এ ধরনের ঘটনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং পুঁজিপতিদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। আর তখনই স্বল্প সময়ের মধ্যে পূর্ববর্তী সব সংকটকে অতিক্রম করে যায় এমন সঙ্কট সৃষ্টি হয় এবং এটি এত বড় আকারে হয় যে তা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভিত্তিসমূহকে ধ্বসিয়ে দেয়। পুঁজিবাদের ধ্বংসস্তুপের উপর অতঃপর প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজতন্ত্র। মার্কসের মতে ঐতিহাসিক বিবর্তনের সর্বশেষ পর্যায় হল সমাজতন্ত্র। কারণ এটি ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে শেষ করে দেয় বিধায় সমাজে আর বৈষম্য সৃষ্টিকারী শ্রেণী সংঘাত থাকে না।

কার্ল মার্কসের বর্ণনায়, কেন্দ্রীভূত করা পুঁজিবাদী অর্থনীতির অংশ। মোদ্দা কথা, একটি প্রকল্প থেকে শ্রম ও মূলধন অন্যটিতে চলে যায় যাতে একজনের বাড়তে থাকলে অপরজনের হ্রাস পেতে থাকে। এসব কিছুই উৎপাদনের কেন্দ্রীভূতকরণকে নির্দেশ করে। যদি কেউ শিল্পের উৎপাদনের কোন একটি শাখাকে পর্যবেক্ষণ করে, যেমন: চকোলেটের কারখানা; যে কেউ দেখতে পাবে যে, ধীরে ধীরে অনেক প্রকল্প হারিয়ে যাচ্ছে। এবংঅন্যদিকে সময়ের সাথে সাথে, প্রত্যেক প্রকল্পে উৎপাদনের শ্রমশক্তি বৃদ্ধি পায়। উৎপাদনের যে কেন্দ্রীভূতকরণ ঘটেছে এটি হল তার প্রমাণ। কেননা বড় উৎপাদন ছোট আকারের উৎপাদনকে প্রতিস্থাপিত করে। সুতরাং উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি কারখানার সংখ্যা দশ থাকে, তবে সময়ের সাথে সাথে সেগুলো চার বা পাঁচটি বড় কারখানায় পরিণত হয় এবং বাকীগুলো হারিয়ে যাবে।

মার্কসের নির্ধারিত মুক্ত প্রতিযোগিতা বলতে কাজ করার স্বাধীনতার মূলনীতিকে বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ এর অর্থ হল যে কোন ব্যক্তির যে কোন কিছু যে কোন পদ্ধতিতে উৎপাদনের অধিকার রয়েছে।

মার্কসের মতে অর্থনৈতিক ভারসাম্যতার ক্ষতি করে এমন হঠাৎ সৃষ্টি হওয়া যে কোন সমস্যার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সঙ্কট বিষয়টি প্রয়োগ হবে। বিশেষ সমস্যার মধ্যে রয়েছে উৎপাদন ও বন্টনের ভারসাম্যহীনতা থেকে উদ্ভূত উৎপাদনের একটি শাখার আওতাধীন সব সমস্যা। এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে অতিরিক্ত উৎপাদন ও বন্টন অথবা কম উৎপাদন ও বন্টনের ক্ষেত্রে।

বারবার পূণরাবৃত্তি হয় এমন বড় সঙ্কটের ক্ষেত্রে এমন প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি হয় যে তা পুরো অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে কম্পন সৃষ্টি করে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও মন্দার মধ্যে পার্থক্য সূচনাকারী বিন্দু হিসেবে কাজ করে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সময়কাল তিন থেকে পাঁচ বছর হয় এবং মন্দার ক্ষেত্রেও একই রকম হয়। এসব পর্যায়ক্রমিক বড় সঙ্কটের বিশেষ বৈশিষ্ট্যই এদেরকে আলাদা করে। এ বৈশিষ্ট্যগুলো তিনটি প্রধান গুণের মধ্যে পড়ে ঃ প্রথমত, সাধারণীকরণের গুণ। এর অর্থ হল একটি দেশে সঙ্কট অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সবগুলো দিকের উপর অথবা কমপক্ষে এর অধিকাংশের উপর আঘাত হানে। এই সাধারণ সঙ্কটটি প্রথমে যে দেশে সমস্যা ঘনীভূত হয় সে দেশে সর্বপ্রথম দেখা দেয় এবং পরবর্তীতে অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশে ছড়িয়ে পড়ে যাদের সাথে প্রথমে সমস্যায় পড়া রাষ্ট্রের কিছু স্থায়ী সম্পর্ক বজায় ছিল। দ্বিতীয় গুণটি হল এটি পর্যায়ক্রমিক। এর অর্থ হল সঙ্কট সৃষ্টি হয় পুণঃপুণিকভাবে ও চক্রাকার সময়ে পালাক্রমে। একটি সঙ্কট ও অপরটির মধ্যে সময়কাল সাত থেকে এগার বছরের মধ্যে উঠানামা করে। পর্যায়ক্রমিক হওয়া সত্ত্বেও একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এ ঘটনা ঘটে না। তৃতীয় গুণটি হল অতিরিক্ত উৎপাদন যাতে করে বড় বড় প্রকল্পের মালিকেরা তাদের উৎপাদিত পণ্য নষ্ট করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ে যায়। সুতরাং অনেক পণ্যের ক্ষেত্রে সরবরাহ উৎপাদনকে ছাড়িয়ে যায় এবং সঙ্কট সৃষ্টি করে।

কার্ল মার্কসের বিবেচনায়, এ বড় সঙ্কট কিছু লোককে মূলধন হারাতে বাধ্য করে। সুতরাং মালিকের সংখ্যা কমতে থাকে এবং শ্রমিকের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এ ঘটনাগুলো সর্বশেষ বড় সঙ্কটের দিকে ধাবিত করবে এবং পুরনো ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে ফেলে দিবে।

এই হচ্ছে সমাজতন্ত্রের সারসংক্ষেপ, যার মধ্যে কমিউনিজমও (সাম্যবাদ) অন্তর্ভূক্ত। উপরের সারাংশ থেকে ফুটে উঠেছে যে, সাম্যবাদীসহ সমাজতান্ত্রিক মতবাদীরা ব্যক্তিদের মধ্যে সত্যিকার অর্থে সমতা বিধানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালায়, হোক তা লাভের ক্ষেত্রে অথবা উৎপাদনের উপকরণের ক্ষেত্রে অথবা প্রকৃত সমতার ক্ষেত্রে। এ ধরনের যে কোন সমতা অর্জন করা দুঃসাধ্য এবং এটি তাত্ত্বিক বিষয় ছাড়া আর কিছুই নয়। এটি অবাস্তব বিধায় অসম্ভব। কারণ এরূপ সমতা অবাস্তব ও বাস্তবতা বিবর্জিত। সৃষ্টিগত কারণেই স্বভাবগতভাবে মানুষ শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতার দিকে থেকে ভিন্নতর এবং চাহিদা পূরণের দিক থেকেও তারা পরস্পর আলাদা। সুতরাং তাদের মধ্যে সমতা অর্জন করা সম্ভব নয়। যদি একজন বলপূর্বক সমপরিমাণ পণ্য ও সেবা বন্টন করেও থাকে তবে তাদের পক্ষে এ সম্পদের দ্বারা উৎপাদন ও সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমতা অর্জন করা অসম্ভব। তাদের নিজ নিজ চাহিদা পূরণ করার জন্য যে পরিমাণ প্রয়োজন সেক্ষেত্রেও সমান হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং তাদের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠা করার বিষয়টি একটি কল্পনাপ্রবণ ও তাত্ত্বিক বিষয়।

তাছাড়া শক্তি/সামর্থ্যের পার্থক্যের কারণে মানুষের মধ্যে সমতা অর্জনের ধারণা ন্যায়বিচার হতে অনেক দূরে অবস্থিত, যা সমাজতান্ত্রিকেরা অর্জনের প্রচেষ্টারত বলে দাবি করে। মালিকানা এবং উৎপাদনের হাতিয়ারের ক্ষেত্রে লোকদের মধ্যে বৈষম্য অবশ্যম্ভাবী এবং খুবই স্বাভাবিক। মানুষের মধ্যে থাকা বিদ্যমান স্বাভাবিক বৈপরীত্যের সাথে সমতা অর্জনের যেকোন প্রচেষ্টা সাংঘর্ষিক হওয়ায় তা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির পুরোপুরি বিলুপ্তি সাধনের ক্ষেত্রে বলা যায় এটি মানুষের প্রকৃতির সাথে সাংঘর্ষিক। কেননা মালিকানা হলো বেঁচে থাকার প্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ এবং এটি মানুষের মধ্যে অস্তিত্বশীল। তার মধ্যে স্বভাবজাত হওয়ায় এটি তারই একটি অংশ এবং প্রবৃত্তিগত হওয়ায় এর নির্মূল সম্ভব নয়। একটি মানুষ যতক্ষণ বেঁচে থাকে ততক্ষণ প্রবৃত্তিগত কোন কিছুই তার থেকে আলাদা করা সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধন মানুষের স্বভাবজাত প্রবৃত্তির উপর এক নিপীড়ন ছাড়া আর কিছুই নয় এবং এটি অস্থিরতা ছাড়া আর কিছুই বয়ে আনে না। সুতরাং এটিকে বিলুপ্তি না করে বরং এই প্রবৃত্তিকে সংগঠিত করা উচিত।

মালিকানার আংশিক বিলুপ্তির বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। যদি এর দ্বারা পণ্যের যা মানুষ অর্জন করতে চায়, তার বিস্তার লাভের লাগাম টানাকে বুঝায় (পরিমাণগতভাবে মালিকানা সীমিত করা), তবে তা উৎপাদনের পরিমাণকে সীমিত করে দিবে, যা আবার সঠিক হবে না, কারণ তা মানুষের কার্যক্রমকে সীমাবদ্ধ করে ফেলে, তার প্রচেষ্টায় বাঁধা সৃষ্টি করে, তার থেকে প্রাপ্ত উৎপাদনকে হ্রাস করে। মানুষকে কোনকিছু অর্জনের ক্ষেত্রে বাঁধা প্রদান করলে এবং একটি নির্দিষ্ট সীমা বেঁধে দিলে, তারা কার্যত এই গন্ডির মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে পড়ে, ব্যক্তিদের কার্যক্রম ব্যাহত হয় এবং জনসাধারণ ঐসব ব্যক্তির উৎপাদনমূখীতার ফল ভোগ করা থেকে বঞ্চিত হয়।

তবে পণ্য ও সেবার মালিকানা যদি প্রাপ্ত পরিমাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে একটি নির্দিষ্ট রীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য। কারণ এটি মানুষের কাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না। এ প্রক্রিয়া ব্যক্তির মধ্যে সম্পত্তির মালিকানাকে সংগঠিত করে এবং তাদেরকে আরও বেশ শ্রম ব্যয় করতে ও কাজ বাড়াতে উৎসাহিত করে।

যদি মালিকানার আংশিক বিলুপ্তি বলতে ব্যক্তিকে বিশেষ কিছু সম্পত্তির মালিকানা অর্জনকে রোধ করা এবং অন্যান্য কিছু সম্পত্তি অসীমভাবে অর্জন করা বুঝায়, তাহলে এ বিষয়টি বিবেচনা করে দেখতে হবে। যদি এসব সম্পত্তির উপযোগের প্রকৃতি কারণে জনগণকে বঞ্চিত করা ছাড়া কেবলমাত্র ব্যক্তি একা ভোগ না করতে পারে তাহলে সে ব্যক্তিকে সে সম্পত্তির মালিকানা অর্জনে বাধা দেয়া খুব স্বাভাবিক হবে, যেমন: জনগনের রাস্তা, টাউন স্কয়ার, নদী, সাগর এবং এজাতীয় অনেক কিছু। সম্পত্তির প্রকৃতির কারণে সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়। সামষ্টিক উপযোগিতা থাকার কারণে এসব সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানা নিষিদ্ধ করা দোষণীয় নয়। কেননা এ ধরনের মালিকানা সম্পত্তির প্রকৃতির উপর নির্ভর করে নির্ধারণ করা হয়।

যদি সম্পত্তির প্রকৃতির কারণে ব্যক্তিগত মালিকানা নিষিদ্ধ করার প্রয়োজন না পড়ে তাহলে বিষয়টি আরও বিশ্লেষণ করে দেখার অবকাশ রয়েছে। যদি সম্পত্তিটি প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে অর্থাৎ সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানা যদি সম্প্রদায়কে বঞ্চিত করে, যেমন- জলাশয় ও খনিজ দ্রব্য, তাহলে এগুলোর ব্যক্তিমালিকানার বিলোপ সাধন করা কখনওই দোষণীয় নয়। যে ইস্যুটি এ ধরনের সম্পত্তিতে প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত করে তা হল সম্পত্তির প্রকৃতি। যদি এর মালিকানা ব্যক্তিগতভাবে অর্জন করা হয়, তাহলে তা জনগণকে বঞ্চিত করবে। তবে যদি এর মালিকানা জনগণকে বঞ্চিত না করে, তাহলে এর মালিকানা অর্জনের ক্ষেত্রে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা থাকা উচিত হবে না। আর যদি তা করা হয়, তবে তা কোন কারণ ব্যতিরেকে অন্যায়ভাবে মালিকানাকে সীমাবদ্ধ করা হবে।এটি হবে পরিমাণগতভাবে মালিকানা সীমিত করারমতইএবং একারণে মানুষের কাজকে সীমিত করে ফেলবে, তার প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করবে, উৎপাদনকে হ্রাস করবে ও কাজ করার স্পৃহাকে স্থবির করে দেবে।

সমাজতন্ত্রে মালিকানার আংশিক বিলোপসাধনের কারণে পরিমাণগতভাবে মালিকানা সীমিত করা হয়, কিন্তু মালিকানা লাভের পথ ও উপায়ের মাধ্যমে তা সীমিত করা হয় না। এটি কিছু সম্পত্তির মালিকানা অর্জনকে প্রতিহত করে যা তাদের প্রকৃতি ও তাদের উৎপত্তির প্রকৃতির কারণে ব্যক্তিগতভাবে মালিকানায় নেয়া উচিত। সমাজতন্ত্র মালিকানাকে পরিমাণগতভাবে সীমিত করে, যেমন: একটি নির্দিষ্ট এলাকা পর্যন্ত ভূমির মালিকানাকে সীমিত করা, অথবা এটি কোন বিশেষ সম্পত্তির মালিকানাকে সীমিত করে, যেমন: উৎপাদনের উপায়। এসব সম্পত্তির অনেকগুলোর প্রকৃতির কারণে সেগুলোকে ব্যক্তিগত মালিকানায় নেয়া যায়। এ ধরনের সম্পত্তির মালিকানাকে সীমিত করার মাধ্যমে কাজকে সীমিত করা হয়, হোক সে সীমিতকরণ আইন দ্বারা

পূর্বনির্ধারিত, যেমন: উত্তরাধিকার প্রতিরোধ, খনিজের মালিকানা, রেল অথবা কলকারখানা; অথবা জনস্বার্থ বিবেচনায় এগুলোর অধিকরণ রোধে অবস্থানুপাতে যদি একে রাষ্ট্রের হাতে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য ছেড়ে দেয়া হয়। সুতরাং এসবগুলোই ব্যক্তির কাজকে সীমিত করার প্রয়াস কারণ প্রকৃতিগত কারণে এই সম্পত্তিগুলো ব্যক্তিমালিকানায় চলে পারে।

জনগণের মধ্যে অসন্তোষ ও উদ্বেগ তৈরি করে এবং তাদের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি করে লোকদের মাধ্যমে উৎপাদন ও বন্টন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এটি বরং ব্যবস্থাপনানয়, বিশৃংখলার সৃষ্টি করে। তাছাড়া সমাজ বিবর্তনের স্বাভাবিক তত্ত্ব অনুসরণে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে 'ব্যবসায়ীরা নির্যাতনকারী', এ বোধ তৈরি করে লোকদের মাধ্যমে উৎপাদন সংগঠিত করা সম্ভব নয়। কেননা ব্যবসায়ীরা শ্রমিক শ্রেণীর চাহিদা পূরণ করার ক্ষেত্রে চতুর ও দক্ষ হতে পারে, যেমনটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কারখানা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে ঘটে। সুতরাং শ্রমিক শ্রেণী তাদের পরিশ্রমের ফল দ্বারা শোষিত হওয়া সত্ত্বেও নির্যাতিত অনুভব করে না। এভাবে তথাকথিত বিবর্তন কাঙ্খিত উৎপাদন ও বন্টনকে নিশ্চিত করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, এ বিষয়গুলোকে সমস্যার সঠিক প্রকৃতিকে নিয়ে কাজ করে একটি সুনির্দিষ্ট ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সঠিক আইন ও সমাধান দ্বারা সংগঠিত করতে হবে। সমাজতন্ত্র উৎপাদন ও বন্টন সুনিশ্চিত করার জন্য হয় শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে উদ্বেগ ও অসন্তোষকে উসকে দেয় অথবা সমাজ বিবর্তনের স্বাভাবিক তত্ত্ব অনুসরণ অথবা সুনির্দিষ্ট কোন ভিত্তি বা বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত নয় এমন মানব সৃষ্ট আইন ও কানুনের উপর নির্ভর করে। সেকারণে এ ধরনের সমাধান ভিত্তি থেকেই ভুল।

এই ছিল সমাজতন্ত্রের ভ্রান্তিগুলো নিয়ে আলোচনা। সুনির্দিষ্টভাবে কার্ল মার্কসের সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বের ভুলগুলো নিম্নের তিনটি ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় ঃ

প্রথমতঃ মূল্য তত্ত্বের উপর তার মত ভুল এবং বাস্তবতা বিবর্জিত। একটি পণ্যের মূল্যের একমাত্র উৎস হল এর উৎপাদনের জন্য ব্যয়কৃত শ্রম-এ মতামতটি বাস্তবতার সাথে অমিল। কেননা ব্যয়কৃত শ্রম একটি উৎস কিন্তু একমাত্র উৎস নয়। এখানে শ্রম ছাড়াও আরও অনেক উপাদান রয়েছে যা পণ্যের মূল্য নির্ধারণে যুক্ত হয়। কাজের জন্য কাঁচামাল রয়েছে, এবং পণ্যের উপযোগীতার কারণে এর চাহিদার বিষয়টিও এখানে অন্তর্ভূক্ত। কাঁচামালের ভেতর এমন উপযোগিতা থাকতে পারে যা কৃত কাজের মূল্যকেও অতিক্রম করতে পারে, যেমন: শিকার। বাজারে পণ্য থেকে প্রাপ্ত উপযোগিতার কোন চাহিদা নাও থাকতে পারে কিংবা এর রপ্তানি নিষিদ্ধ হতে পারে, যেমন: মুসলিমদের ক্ষেত্রে মদ। সুতরাং বিনিয়োগকৃত শ্রমই মূল্যের একমাত্র উৎস কথাটি সঠিক নয় এবং এটা পণ্যের বাস্তবতার সাথে অমিল।

দ্বিতীয়তঃ তার মতবাদ অনুযায়ী যে কোন যুগে একটি সমাজের ব্যবস্থা সে সময়ের অর্থনৈতিক অবস্থার ফলাফল, এবং একটি কারণে এ ব্যবস্থার মধ্যে সবধরনের রূপান্তর সংঘটিত হয়, আর তা হচ্ছে বস্তুগত অবস্থার উন্নতির জন্য শ্রেণী সংগ্রাম, এটিও ভুল এবং ভিত্তিহীন, এবং ত্রুটিযুক্ত কল্পনাপ্রসূত চিন্তার উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐতিহাসিক ঘটনা ও বর্তমান অবস্থা থেকে এর ভ্রান্তি ও বাস্তবতার সাথে সাংঘর্ষিক অবস্থান সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়া যায়। আমরা দেখি যে, রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের দিকে যে রূপান্তর তা বস্তুগত বিবর্তনের কারণে সংঘটিত হয়নি কিংবা শ্রেণী সংগ্রামের কারণে ব্যবস্থার পরিবর্তন ত্বরান্বিত হয়নি। বরং একটি দল রক্তাক্ত বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণ করে এবং লোকদের উপর তাদের চিন্তা প্রয়োগ করে এবং ব্যবস্থার পরিবর্তন করে। একই ঘটনা সমাজতান্ত্রিক চীনেও সংঘটিত হয়েছে। পশ্চিম জার্মানী নয় বরং পূর্ব জার্মানীতে, পশ্চিম ইউরোপ নয় বরং পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের প্রয়োগ কখনওই শ্রেণী সংগ্রামের কারণে সংঘটিত হয়নি। বরং সেসব দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছিল অপর একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র দ্বারা দখল করে নেয়ার মাধ্যমে, যেখানে বিজয়ী দেশ বিজিত দেশে তার ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়েছিল। একই বিষয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্র, ইসলামী রাষ্ট্র ও অন্যান্য রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও হয়েছিল। তাছাড়া এ তত্ত্বের মাধ্যমে যেসব দেশের ব্যবস্থা শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে পরিবর্তিত হবে বলে ধরে নেয়া হয়েছিল, যেমন: জার্মানী, ইংল্যান্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সেসব দেশগুলো সব পুঁজিবাদী রাষ্ট্র, যেখানে পুঁজির মালিক ও শ্রমিক শ্রেণী অনেক। জার শাসিত রাশিয়া বা চীন শিল্পোন্নত ছিল না, বরং কৃষিভিত্তিক ছিল এবং সেখানে পুঁজির মালিকের সংখ্যা পশ্চিমের তুলনায় অনেক কম ছিল। পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকায় এ দু'টি শ্রেণীর ব্যাপক উপস্থিতি সত্ত্বেও সেগুলো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়নি এবং এখন পর্যন্ত এসব দেশে পুঁজিবাদই প্রয়োগ করা হচ্ছে। এ দু'টি শ্রেণীর উপস্থিতি তাদের ব্যবস্থার উপর কোন প্রভাব সৃষ্টি করেনি। এ আলোচনাই ভিত্তি থেকে এ তত্ত্বের যুক্তি খন্ডনের জন্য যথেষ্ট।

তৃতীয় ত্রুটি যা কার্ল মার্কস থেকে উদ্ভূত হয়েছে তা হল সামাজিক বিবর্তন তত্ত্ব-যেখানে সে বলেছে যে, নিয়ন্ত্রনকারী অর্থনৈতিক তত্ত্বের কারণে অর্থনৈতিক জীবনের ব্যবস্থা বিলোপ হতে বাধ্য অর্থাৎ বর্তমান ব্যবস্থা যে অর্থনৈতিক তত্ত্ব দ্বারা পরিচালিত সে কারণেই তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এবং একারণেই অভিজাত শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে মধ্যবিত্ত শ্রেণী জয়লাভ করেছে অর্থাৎ কেন্দ্রীভূতকরণ তত্ত্বের কারণে পুঁজিপতি শ্রেণী শ্রমিক শ্রেণীর জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে। কার্ল মার্কসের উৎপাদনের কেন্দ্রীভূতকরণ তত্ত্বের ভিত্তিতে শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং পুঁজির মালিকেরা হ্রাস পাবে, এটাও ভুল। কেননা উৎপাদনের কেন্দ্রীভূতকরণের একটি সীমা রয়েছে যা এটি অতিক্রম করতে পারে না। সুতরাং একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় পৌঁছানোর পর সেখানেই থেমে যায়, বিধায় কার্ল মার্কস বর্ণিত বিবর্তনের জন্য প্রভাবক হিসেবে আর কাজ করতে পারে না। তাছাড়া উৎপাদনের কেন্দ্রীভূতকরণ বিষয়টি উৎপাদনের একটি শাখায় মোটেও অস্তিত্বশীল নয়, যেমন: কৃষি। তাহলে কীভাবে সমাজ বিবর্তনের তত্ত্ব সেখানে কাজ করে? পাশাপাশি কার্ল মার্কসের মতে, উৎপাদনের কেন্দ্রীভূতকরণের পর সম্পদের কেন্দ্রীভূতকরণ ঘটে, যার ফলশ্রুতিতে বিনিয়োগকারীর সংখ্যা কমতে থাকে এবং শ্রমিকের

সংখ্যা বাড়তে থাকে, যাদের কোন কিছুই নেই। এই দৃষ্টিভঙ্গি ভুল। কেননা উৎপাদনের কেন্দ্রীভূতকরণ পুঁজির মালিকের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে এবং শ্রমিক শ্রেণীকে পুঁজির মালিক বানিয়ে দিতে পারে। বড় বড় কর্পোরেশন দ্বারা পরিচালিত বড় বড় প্রজেক্টসমূহে শ্রমিক শ্রেণী থেকে সাধারণত শেয়ারধারী থাকে-যা উপরোক্ত তত্ত্বকে খন্ডনকারী উদাহরণ। তাছাড়া কারখানার অনেক শ্রমিকের রয়েছে উচ্চ বেতন, যেমন: প্রকৌশলী, রসায়নবিদ এবং ব্যবস্থাপক-যারা তাদের বেতনের একটি বড় অংশ সঞ্চয় করতে পারে এবং নিজেরা স্বাধীনভাবে কোন প্রজেক্ট করা ছাড়া বিনিয়োগকারী হতে পারে। সুতরাং কার্ল মার্কস শ্রমিক শ্রেণী ও বিবর্তন নিয়ে যা বলেছে তা এদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয় না।

পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র (যা থেকে কমিউনিজম বা সাম্যবাদ উৎসারিত) যেসব নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সে বিষয়ে এটিই হল সংক্ষিপ্ত আলোচনা। এ নিরীক্ষাধর্মী আলোচনা থেকে এসব মূলনীতির মধ্যে যে ভ্রান্তিসমূহ বিদ্যমান রয়েছে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এটি হল একদিকে এবং অন্যদিকে উভয় ব্যবস্থা ইসলাম যেভাবে একটি সমস্যাকে সমাধান করে তার সাথে এবং ইসলামের নিজের সাথে সাংঘর্ষিক।

সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ইসলামী পদ্ধতির সাথে অন্যগুলোর সাংঘর্ষিক হওয়ার ক্ষেত্রে বলা যায়, ইসলাম অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছে তা অন্যান্য মানবিক সমস্যাসমূহ সমাধান করার ক্ষেত্রে গৃহীত পদ্ধতির অনুরূপ। ইসলামের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি হল অর্থনৈতিক সমস্যার বাস্তবতা পর্যবেক্ষণ করা, এটিকে অনুধাবন করা এবং অতঃপর শারী'আহ্ দলিল অধ্যয়ন করে সেসব দলিল থেকে সমাধান বের করে নিয়ে আসা এবং নিশ্চিত করা যে এ সমাধান সে বিশেষ সমস্যার ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হচ্ছে। এটি পুঁজিবাদ ও সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতি থেকে আলাদা। পুঁজিবাদে যে বাস্তবতা থেকে সমস্যা উদ্ভূত হয়েছে সেখানেই সমাধান খোঁজা হয় (pragmatism)। আর সমাজতন্ত্রে সমাধান নেয়া হয় কাল্পনিক ধারণা থেকে এবং সমস্যার মধ্যে তা অস্তিত্বশীল ধরে নেয়া হয়, এবং সেসব ধারণা অনুসারে সমাধান করা হয়। এ দু'টি পদ্ধতির প্রত্যেকটি ইসলাম থেকে আলাদা। সুতরাং মুসলিমদের এটি গ্রহণ করা অনুমোদিত নয়।

ইসলামের সাথে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক (সাম্যবাদসহ) অর্থনীতির মূল সাংঘর্ষিক দিক হচ্ছে ইসলাম অর্থনৈতিক সমাধান সমূহকে ঐশী হুকুম (আহ্কাম শারী'আহ্) হিসেবে গ্রহণ করেছে যা হুকুম শারী'আহ্'র উৎস হতে উৎসারিত এবং অন্যদিকে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সমাধান ঐশী হুকুম নয়, বরং তা কুফর ব্যবস্থা থেকে উৎসারিত। তাদের মত করে কোন কিছু যাচাই করা হলে তা হবে আল্লাহ্ যা নাযিল করেছে তা ব্যতিরেকে অন্য কিছুকে মেনে নেয়ার মত, যা কখনওই কোন মুসলিমের জন্য গ্রহণ করা অনুমোদিত নয়। এই সমাধানে বিশ্বাস না করেও একে গ্রহণ করা হবে প্রকাশ্য গুণাহ্র কাজ। আর যদি কেউ বিশ্বাস করে যে, এগুলোই হল উপযুক্ত আইন এবং ইসলামী হুকুমসমূহ আধুনিক যুগে প্রযোজ্য নয় এবং বর্তমান অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান দিতে পারে না, তাহলে সেটি কুফর। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে এই পাপ থেকে রক্ষা করুন!

অধ্যায় ২: অর্থনীতি

অর্থনীতি (Economy) শব্দটি একটি পুরনো গ্রীক শব্দ হতে উৎপত্তি হয়েছে, যার অর্থ হলো গৃহস্থালীর কাজের জন্য পরিকল্পনা করা যাতে এর কর্মক্ষম সদস্যগণ পণ্য উৎপাদন ও দায়িত্ব পালন করে, এবং এর সব সদস্যগণ তাদের অধীনে থাকা সবকিছু ভোগ করে। সময়ের আবর্তে লোকেরা গৃহের সংজ্ঞাকে রাষ্ট্র দ্বারা পরিচালিত একটি সম্প্রদায় পর্যন্ত পরিব্যপ্ত করেছেন।

অর্থনীতি শব্দটি সঞ্চয় কিংবা সম্পদ বোঝানোর মতো ভাষাগত অর্থে প্রয়োগের অভিপ্রায়ে ব্যবহার করা হয়নি। বরং এখানে একে প্রায়োগিক অর্থে অর্থাৎ উৎপাদন বৃদ্ধি কিংবা একে নিশ্চিত করার মতো সম্পদের ব্যবস্থাপনার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যা অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়; অথবা সম্পদের বন্টন ব্যবস্থার অর্থে যা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আলোচ্য বিষয়।

যদিও অর্থনৈতিক বিজ্ঞান ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উভয়ই অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করে, তদুপরি এদের স্বকীয় অর্থ রয়েছে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পদের পরিমাণের উঠানামা দ্বারা প্রভাবিত হয় না। সম্পদের পরিমাণের উঠানামা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ধরণের উপরও কোন প্রভাব ফেলে না। সুতরাং অর্থনীতিকে একটি মাত্র বিষয় হিসেবে দেখা, এবং একে একটি প্রসঙ্গ হিসেবে আলোচনা করা একটি মারাত্নক ভুল। কেননা তা সমাধানের প্রয়োজন অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো সম্পর্কে ত্রুটিপূর্ণ উপলব্ধির দিকে ধাবিত করে কিংবা যে নিয়ামকসমূহ দেশের সম্পদ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে সেগুলোকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে ত্রুটি দেখা দিতে পারে। কারণ, সম্পদ বৃদ্ধির দৃষ্টিকোন থেকে জনগণের বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা হলো এক ইস্যু, এবং সম্পদ বন্টনের দৃষ্টিকোন থেকে জনগণের বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা হলো সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি ইস্যু। সুতরাং অর্থনৈতিক বস্তুর ব্যবস্থাপনার বিষয়টিকে এর বন্টন ব্যবস্থাপনার বিষয় থেকে আলাদা করে দেখতে হবে। প্রথমটি উপকরণের সাথে জড়িত এবং পরেরটি চিন্তার সাথে সম্পর্কিত। জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী (একটি আদর্শের বিশ্বাস) উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা চিন্তার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আলোচিত হতে হবে এবং অর্থনৈতিক বিজ্ঞানকে অবশ্যই বিজ্ঞান হিসেবে আলোচনা করতে হবে যার সাথে জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর কোন সম্পর্ক নেই। তাই এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কেননা অর্থনৈতিক সমস্যা মানবজাতির চাহিদা, এগুলো পূরণের উপকরণ এবং এই উপকরণসমূহের সদ্ব্যবহারকে ঘিরে আবর্তিত হয়। যেহেতু উপকরণসমূহ এ মহাবিশ্বে অস্তিত্বশীল, সেহেতু এদের উৎপাদন চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে অপরিহার্য কোন সমস্যা সৃষ্টি করে না, বরং মানুষের প্রয়োজনই তাকে এই উপকরণসমূহকে উৎপাদনের দিকে তাড়িত করে। তবে প্রকৃত সমস্যা বিদ্যমান মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের মাঝে, অর্থাৎ সমাজে, যা এসব উপকরণকে সদ্ব্যবহার করার ব্যাপারে জনগণকে সুযোগ দেয়া কিংবা নিয়ন্ত্রন আরোপ করার কারণে সৃষ্ট হয়। এসব উপকরণের উপর মানুষের মালিকানা সম্পর্কিত বিষয় হতে সৃষ্ট। এটাই হলো অর্থনৈতিক সমস্যার ভিত্তি যার অবশ্যই সমাধান প্রয়োজন। সুতরাং উপযোগের মালিকানা থেকে অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়, উপযোগ প্রদানকারী উপকরণের উৎপাদন থেকে নয়।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি

একটি বস্তু থেকে প্রাপ্ত উপযোগই মানুষের প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে সে বস্তুর উপযোগিতাকে উপস্থাপন করে। উপযোগ দু'টি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। একটি হলো ঐ বিশেষ বস্তুর জন্য মানুষ কতটুকু তাগিদ অনুভব করে এবং দ্বিতীয়টি হলো বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান যোগ্যতা ও মানুষের চাহিদা পূরণের সক্ষমতা যা বিশেষ কোন ব্যক্তির চাহিদার বিপরীত। এ উপযোগ আসতে পারে মানুষের প্রচেষ্টার মাধ্যমে, পণ্যের মাধ্যমে অথবা উভয়ের মাধ্যমে। মানবীয় প্রচেষ্টার মধ্যে রয়েছে কায়িক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রম যা সে সম্পদ সৃষ্টি অথবা সম্পত্তি থেকে উপযোগ লাভের জন্য বিনিয়োগ করে। পণ্য শব্দটি দ্বারা সদ্ব্যবহারের জন্য ক্রয়, ইজারা বা ধার করার মাধ্যমে অধিকারে থাকা যে কোন বস্তুকে বুঝায়, হোক সেটা ভোগের মাধ্যমে, যেমন: কোন আপেল বা ব্যবহারের মাধ্যমে, যেমন: গাড়ি, অথবা ধার করা একটি মেশিনকে সদ্ব্যবহার করা বা একটি বাড়ীকে ইজারা নেয়া। সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে অর্থ, যেমন: সোনা বা রূপা, পণ্য যেমন: পোষাক পরিচ্ছদ ও খাদ্যদ্রব্য এবং স্থাবর সম্পত্তি, যেমন: বাড়ী বা কলকারখানা এবং মানুষের অধিকারে থাকা এরকম অনেক কিছু। যেহেতু সম্পত্তি নিজে থেকেই মানুষের প্রয়োজন মেটায় এবং মানুষের প্রচেষ্টা হলো সম্পত্তি অর্জন বা এর থেকে উপযোগ পাওয়ার মাধ্যম, সেহেতু সম্পদ হলো উপযোগ প্রাপ্তির ভিত্তি ও মানুষের শ্রম হলো সম্পত্তি অর্জনে সমর্থবান করে তুলার একটি উপায় মাত্র। সুতরাং প্রকৃতিগতভাবে মানুষ অধিকার করার উদ্দেশ্যে সম্পত্তি লাভের জন্য প্রচেষ্টা চালায়। সুতরাং মানুষের প্রচেষ্টা এবং সম্পত্তি হলো প্রয়োজন মেটাবার উপকরণ। এগুলো হলো সম্পত্তি যা অর্জন করার জন্য মানুষ প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালায়। সুতরাং সম্পদ বলতে সম্পত্তি এবং মানুষের প্রচেষ্টাকে একত্রে বুঝায়।

ব্যক্তির সম্পত্তি লাভ ঘটতে পারে অন্যের মাধ্যমে, যেমন: উপহার হিসেবে সম্পত্তি লাভ করা, অথবা প্রত্যক্ষভাবে, যেমন: কাঁচামালের মালিক হওয়া। পণ্য অর্জনের অপরিহার্যতা হতে পারে:

১. ভোগের জন্য, যেমন: একটি আপেল অধিকারে থাকা
২. সদ্ব্যবহার করা, যেমন: একটি বাড়ীর মালিক হওয়া
৩. সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত উপযোগের অধিকারী হওয়া, যেমন: একটি বাড়ী ইজারা করা
৪. অথবা মানুষের শ্রমলব্ধ উপযোগের অধিকারী হওয়া, যেমন: একজন স্থপতির নকশা

সম্পদের মালিক হওয়ার ধরণ হলো- ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে, যেমন: সম্পত্তি ইজারা বা বিক্রয় করা এবং কর্মচারীদের বেতন, অথবা এটা ক্ষতিপূরণ নয়, হতে পারে সাহায্য, মঞ্জুরী, উপহার, উত্তরাধিকার অথবা ঋণ। তবে অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি হয় সম্পদের মালিকানা লাভের ক্ষেত্রে, কিন্তু সম্পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে নয়। অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি হয় মালিকানার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে, মালিকানার মন্দ বিন্যাস থেকে এবং লোকদের মাঝে সম্পদের অসম বন্টন থেকে। সমস্যা অন্য কোন বিষয় থেকে উদ্ভুত হয় না এবং এ বিষয়টির দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করাই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যে ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তা তিনটি মূলনীতির সমন্বয়ে গঠিত:

১. মালিকানা
২. মালিকানার হস্তান্তর (Disposal) এবং
৩. লোকদের মাঝে সম্পদের বন্টন

অর্থনীতির প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী

সম্পদের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী এর সদ্ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর চেয়ে ভিন্নতর। যে উপকরণ উপযোগ (Benefit) উৎপাদন করে তার চেয়ে উপযোগের সত্ত্বাধিকারী হওয়ার বিষয়টিকে ভিন্নতর বিষয় হিসেবে ইসলাম বিবেচনা করে। সুতরাং সম্পত্তি এবং মানুষের শ্রম হলো সম্পদের উপাদান বা উপকরণ, এবং এই উপকরণসমূহ উপযোগ তৈরি করে। ইসলামের দৃষ্টিতে জীবনে এদের অস্তিত্ব ও উৎপাদন এদের ব্যবহার ও উপযোগের মালিকানা লাভ করার প্রশ্ন থেকে ভিন্নতর। সুতরাং কিছু সম্পদের সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইসলাম সরাসরি হস্তক্ষেপ করেছে, উদাহরণস্বরূপ এটি কিছু পণ্য যথা: মদ এবং মৃত খাদ্যদ্রব্যকে নিষিদ্ধ করেছে। একইভাবে এটা মানুষের কিছু কাজ থেকে উপযোগ পাওয়াকে নিষিদ্ধ করেছে, যেমন: নাচ এবং বেশ্যাবৃত্তি। তাছাড়া ইসলাম হারাম খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা এবং হারাম কর্মকান্ড সম্পাদনের জন্য কাউকে নিয়োগ প্রদানকে নিষিদ্ধ করেছে। এটি হল সম্পত্তির সদ্ব্যবহার ও মানুষের শ্রমের ক্ষেত্রে। তবে সম্পত্তি ও মানুষের শ্রমের মালিক হওয়ার ক্ষেত্রে ইসলাম একে নিয়ন্ত্রন করার জন্য অসংখ্য হুকুম দিয়েছে, যেমন: শিকারের হুকুম, ভূমি পুণরুদ্ধার, ইজারা, উৎপাদন, উত্তরাধিকার, দান এবং অসিয়ত সম্পর্কিত হুকুমসমূহ।

এগুলো হলো সম্পদের সদ্ব্যবহার এবং এর প্রাথমিক মালিকানার বিষয়াদি। সম্পদ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ইসলাম মানুষকে সাধারণভাবে উপার্জনের জন্য প্রণোদিত করার মাধ্যমে উৎসাহ দিয়েছে। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কারিগরি পদ্ধতির আলোচনা বা উৎপাদনের পরিমাণের ক্ষেত্রে ইসলাম হস্তক্ষেপ করেনি, বরং এটাকে লোকদের ইচ্ছার উপর ন্যস্ত করেছে।

সম্পত্তির অস্তিত্বের ক্ষেত্রে বলা যায়, এটা এ পৃথিবীতে প্রাকৃতিকভাবেই রয়েছে। মানুষের প্রয়োজনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

"তিনিই সেই সত্ত্বা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু জমিনে রয়েছে সে সমস্ত।" [সূরা বাক্বারা: ২৯]

"তিনি আল্লাহ্ যিনি সমুদ্রকে তোমাদের উপকারার্থে আয়ত্বাধীন করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর আদেশক্রমে তাতে জাহাজ চলাচল করে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ তালাশ করো ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও।" [সূরা আল-জাসিয়া: ১২]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) আরও বলেন,

"এবং আয়াত্বাধীন করে দিয়েছেন তোমাদের, যা আছে নভোমন্ডলে ও যা আছে ভূমন্ডলে; তাঁর পক্ষ থেকে। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।" [সূরা আল-জাসিয়া: ১৩]

এবং তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) আরও বলেন,

"মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক, আমি আশ্চর্য উপায়ে পানি বর্ষণ করেছি, এরপর আমি ভূমিকে বিদীর্ণ করেছি। অতঃপর তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য, আঙুর ও শাক-সবজি, যয়তুন, খেজুর, ঘন উদ্যান, ফল এবং ঘাস, তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদের উপকারার্থে।" [সূরা আবাসা: ২৪-৩২]

এবং তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

"আমি তাঁকে তোমাদের জন্যে বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে। অতএব তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে?" [সূরা আম্বিয়া: ৮০]

"আর আমি নাযিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচন্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার।" [সূরা হাদীদ: ২৫]

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এইসব এবং অন্যান্য আয়াতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনিই সম্পত্তি এবং মানুষের শ্রমকে সৃষ্টি করেছেন, এবং এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পারে এমন কিছু নিয়ে তিনি আলোচনা করেননি; যা থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সম্পত্তি ও মানুষের পরিশ্রমের সদ্ব্যবহার দেখানো ছাড়া এগুলোর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেননি। তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সম্পদ সৃষ্টিতেও হস্তক্ষেপ করেননি; এমন কোন শারী'আহ্ দলিল দেখানো সম্ভবপর নয় যেখানে সম্পদ সৃষ্টির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। উল্টো আমরা দেখতে পাই শারী'আহ্ সম্পদ আহরণ ও মানুষের প্রচেষ্টাকে উন্নততর করার বিষয়টি মানুষের উপর ছেড়ে দিয়েছে। হাতের মাধ্যমে খেজুর গাছের পরাগায়নের ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন,

"তোমরা তোমাদের দৈনন্দিন কাজের ব্যাপারে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল আছো।" এটাও বর্ণিত আছে যে মুহাম্মদ (সাঃ) অস্ত্র উৎপাদনের কৌশল শেখার জন্য দু'জন মুসলিমকে ইয়ামেনের জুরাসে প্রেরণ করেছিলেন। এই উদাহরণসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, শারী'আহ সম্পদ সৃষ্টির বিষয়টি মানুষের উপর অর্পণ করেছে যা তার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে উৎপাদিত হবে।

এসব থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ইসলাম অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে, অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের প্রতি নয়। এটা সম্পদের ব্যবহার, এবং তা হতে উপযোগ প্রাপ্তির পদ্ধতিকে এর আলোচ্য বিষয়বস্তু হিসেবে নির্ধারণ করেছে। এটা সম্পদ উৎপাদন কিংবা উপযোগ লাভের বিভিন্ন উপায়ের উপর মোটেও আলোকপাত করেনি।

ইসলামে অর্থনৈতিক নীতি

অর্থনৈতিক নীতি হলো আইনের লক্ষ্য যা মানুষের বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা করে। ইসলামে অর্থনৈতিক নীতি হলো প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সব মৌলিক চাহিদাকে পূর্ণাঙ্গরূপে পূরণ করা, এবং একটি আদর্শিক সমাজে বসবাসরত একজন ব্যক্তির জন্য তার সামর্থ্য অনুযায়ী বিলাসদ্রব্য অর্জনের সুযোগ করে দেয়া। অর্থাৎ ইসলাম একটি দেশে বসবাসরত মোট জনগোষ্ঠীকে ব্যক্তিসমষ্টি হিসেবে চিন্তা না করে প্রত্যেক ব্যক্তিকে এককভাবে বিবেচনা করে। তাকে প্রথমত একজন মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে যার সকল মৌলিক চাহিদা সম্পূর্ণ পূরণ করতে হবে এবং অত:পর বিবেচনা করে ব্যক্তি বিশেষ হিসেবে যাতে সে তার সামর্থ্য অনুযায়ী বিলাসদ্রব্য অর্জনের সুযোগ করে দিতে হবে। একইসময় ইসলাম তাকে এমন একজন ব্যক্তি হিসেবে দেখে যে অন্যদের সাথে একটি নির্দিষ্ট রীতি অনুযায়ী বিভিন্ন সম্পর্কের মাধ্যমে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। প্রত্যেক ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ অধিকারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না করে শুধু দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা ইসলামী অর্থনৈতিক নীতির লক্ষ্য নয়। শুধুমাত্র সমাজে চাহিদাসমূহ পূরণের জন্য বিভিন্ন উপকরণের যোগান দেয়াও নয়, বরং এসব উপকরণ হতে সামর্থ্য অনুযায়ী সুবিধা নেয়ার জন্য মানুষকে তার স্বাধীন ইচ্ছার উপর ছেড়ে না দিয়ে প্রত্যেকের জীবনধারণের অধিকারকে নিরাপত্তা প্রদান করে। এটি প্রত্যেক ব্যক্তির সমস্যাকে মানবীয় সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করে যারা একটি সম্পর্কের মধ্যে আবদ্ধ থেকে বসবাস করে। অত:পর একটি নির্দিষ্ট জীবনরীতি অনুসারে তার জীবনমান উন্নত করে এবং স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনের জন্য নিজেকে সামর্থ্যবান করে তোলে। এভাবে এটি অন্যান্য অর্থনৈতিক নীতির চেয়ে আলাদা।

মানুষের জন্য অর্থনৈতিক হুকুমসমূহ প্রণয়নের সময়, ইসলাম হুকুমগুলোকে ব্যক্তির জীবনধারণের অধিকার এবং বিলাসসামগ্রী অর্জনের নিরাপত্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছে, এবং একই সময়ে এটা নিশ্চিত করেছে যে, সমাজে একটি বিশেষ জীবনব্যবস্থা বিদ্যমান। সুতরাং, ইসলাম একটি সমাজ কেমন হবে সেটা বিবেচনায় আনে, এবং পাশাপাশি একই সময়ে নিরাপদ জীবিকা এবং বিলাসসামগ্রী প্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিত করে। একটি সমাজ কেমন হবে এ ব্যাপারে গৃহিত দৃষ্টিভঙ্গীকেই সে জীবিকা ও সমৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে তার দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তি করেছে। সুতরাং, যেকেউ আহকামে শারী'আহ্-তে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাবে যে তা পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের জন্য মৌলিক অধিকারসমূহকে (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান) নিশ্চিত করেছে। এটা অর্জিত হয় প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তিকে কাজ করতে বাধ্য করার মাধ্যমে, যাতে সে নিজের এবং তার উপর নির্ভরশীলদের মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণ করতে পারে। ইসলাম কাজ করতে অক্ষম পিতামাতার দায়িত্ব তাদের সন্তান বা উত্তরাধিকারীদের হাতে অর্পণ করেছে, এবং দায়িত্ব নেয়ার মতো কেউ না থাকলে বায়তুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগারের উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করেছে। ইসলাম এমনভাবে তা করেছে যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের এবং তার উপর নির্ভরশীলদের মৌলিক চাহিদাসমূহ তথা পর্যাপ্ত খাবার, বস্ত্র এবং বাসস্থান নিশ্চিত করাকে তার ইসলামী দায়িত্ব মনে করে। এবং অতঃপর সামর্থ্য অনুযায়ী বিলাসদ্রব্য অর্জনের প্রতি উৎসাহিত হয়।

কিছু বিশেষ ক্ষেত্র বাদে জনগণের কাছ থেকে করারোপ করে সম্পদ হরণ করাকে ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে, যেমন: জিহাদ বা দূর্ভিক্ষের সময় সব মুসলিমের উপর কর দেয়া বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। আর এ করারোপ করা হবে সে সম্পত্তির উপর যা সাধারণত একজন ব্যক্তি তার মৌলিক অধিকার ও বিলাসসামগ্রী পূরণের পর উদ্বৃত্ত থাকে। এভাবে এটা প্রত্যেকের জীবিকা অর্জনের অধিকার পূরণ করে এবং বিলাসসামগ্রী অর্জনের পথকে সুগম করে। এছাড়া ইসলাম তার মৌলিক অধিকার ও বিলাসসামগ্রী উপার্জনের ক্ষেত্রে কিছু কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছে এবং একটি নির্দিষ্ট রীতির মাধ্যমে তার সাথে অন্যদের সম্পর্ক বজায় রেখেছে। সেকারণে ইসলাম মুসলিমদের জন্য মদ উৎপাদনকে নিষিদ্ধ করেছে এবং এটিকে অর্থকারী পণ্য হিসেবে গণ্য করে

না। ইসলাম রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের জন্য সুদকে এবং লেনদেনের সময় এর ব্যবহারকে নিষিদ্ধ করেছে। ইসলাম মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে কারো জন্যই সুদকে অর্থনৈতিক পণ্য হিসেবে গণ্য করে না। সুতরাং অর্থনৈতিক পণ্যের সদ্ব্যবহারের জন্য ইসলাম কোন সম্পত্তি সদ্ব্যবহারের সময় একটি সমাজ কেমন হবে তাকে মৌলিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে।

ইসলাম একজনের ব্যক্তি সত্ত্বাকে তার মানবীয় সত্ত্বা কিংবা তার মানবীয় সত্ত্বাকে তার ব্যক্তি সত্ত্বা হতে আলাদা করে না। তাছাড়া প্রত্যেক ব্যক্তির মৌলিক চাহিদা পূরণের নিরাপত্তা এবং বিলাসামগ্রী অর্জনের সুযোগ প্রদানকে, একটি সমাজ কেমন হবে তা হতে আলাদা করেনা। বরং, ইসলাম চাহিদা পূরণ এবং সমাজ কেমন হবে, এই দুটি বিষয়কে পরস্পর অবিচ্ছেদ্য বিষয় মনে করে কিন্তু এক্ষেত্রে সমাজব্যবস্থার ধরণকে মৌলিক চাহিদা পূরণের ভিত্তি বানিয়েছে। সকল মৌলিক চাহিদাগুলোকে পূর্ণাঙ্গভাবে পূরণ এবং বিলাসদ্রব্য অর্জনে সক্ষম করার স্বার্থে, অর্থনৈতিক পণ্য সহজলভ্য করতে হবে, এবং ততক্ষণ পর্যন্ত এগুলোকে সহজলভ্য করা যাবে না যতক্ষন পর্যন্ত না তারা এগুলো অর্জনে প্রাণান্তকর চেষ্টা চালায়। সুতরাং, ইসলাম জনগণকে উপার্জন, রিযিক অন্বেষণ এবং প্রতিযোগীতার আহ্বান জানায়। এবং ইসলাম ব্যক্তির নিজের জন্য এবং তার উপর নির্ভরশীল বাকি সদস্যদের ভরণপোষণের জন্য প্রত্যেক কর্মক্ষম ব্যক্তির জন্য রিযিক অন্বেষণকে ফরয করেছে।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

"অতএব, তোমরা তাতে বিচরণ করো এবং তাঁর দেয়া রিযিক আহার করো।" [সূরা মূলক: ১৫]

তবে এর অর্থ এই নয় যে, ইসলাম সম্পদের উৎপাদন কিংবা সম্পদের উৎপাদন ও পরিমাণ বৃদ্ধির কারিগরী কৌশলের দিকে হস্তক্ষেপ করেছে। বরং এটি সম্পত্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে উপার্জনের জন্য উৎসাহিত করেছে। সম্পত্তি অর্জনের ব্যাপারে উৎসাহিত করে অনেক হাদীস এসেছে।

একটি হাদীসে উল্লেখ আছে যে, **রাসূলুল্লাহ্ (সা:) সাদ ইবনে মু'আজ (রা.)-এর সাথে হাত মেলালেন এবং তার হাত রুক্ষ পেলেন। যখন রাসূল (সা:) এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলেন, তখন তিনি (রা.) বললেন: "আমি পরিবারের ভরণপোষণের জন্য বেলচা দিয়ে খনন করেছি।" রাসূল (সা:) তার হাতে চুমু খেলেন এবং বললেন: "এই হাতদ্বয়কে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পছন্দ করেন"**। যা আল-শারখাশি তার আল-মাবসুত-এ বর্ণনা করেছেন। এবং আল-বুখারী আল-মিকদাম হতে বর্ণনা করেছেন যে রাসূল (সা:) বলেছেন: **"স্বীয় হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে ভাল খাবার আর কেউ কখনও খায়নি।"**

বর্ণিত আছে যে, উমর বিন আল খাত্তাব (রা.) কিছু লোককে অতিক্রম করছিলেন, যারা কুর'আন পাঠকারী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি তাদের বসে থাকতে এবং মাথা নোওয়াতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন: "তারা কে?" তাকে বলা হলো: "এরা হচ্ছে সে সমস্ত লোক যারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র উপর ভরসা করে।" প্রত্যুত্তরে উমর (রা.) বললেন: "না, তারা হলো সে সমস্ত লোক যারা লোকেদের সম্পত্তি ভক্ষণ করে। তোমরা কি চাও আমি তাদের কথা বলি যারা সত্যিকারভাবেই আল্লাহ্'র উপর নির্ভর করে?' তিনি বললেন: "এরা হচ্ছে সে সমস্ত লোক যারা বীজকে ভূমিতে বপন করে এবং সর্বশক্তিমান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উপর ভরসা করে।"

সুতরাং এসব আয়াত এবং হাদীসসমূহ রিযিক অন্বেষণ, সম্পত্তি অর্জনের জন্য কাজ করার ব্যাপারে উৎসাহী করে যেমনভাবে এগুলো সম্পত্তির ভোগ এবং ভালো খাদ্যগ্রহণের ব্যাপারে উৎসাহিত করে।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

"আপনি বলুন: আল্লাহ্'র সাজ-সজ্জাকে যা তিনি বান্দাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র খাদ্রবস্তুসমূহকে কে হারাম করেছে?" [আল-আরা'ফ: ৩২]

এবং

"আল্লাহ্ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে, এই কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে বলে তারা যেন ধারণা না করে। বরং এটা তাদের পক্ষে একান্তই ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে। যাতে তারা কার্পণ্য করে সে সমস্ত ধন-সম্পদকে কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ী বানিয়ে পরানো হবে। আর আল্লাহ্ হচেছন আসমান ও যমীনের পরম সত্ত্বাধিকারী। আর যা কিছু তোমরা কর; আল্লাহ্ সে সম্পর্কে জানেন।" [সূরা আলি-ইমরান: ১৮০]

এবং

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্যে ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর এবং তা থেকে নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করতে মনস্থ করো না।" [সুরা আল বাক্বারা: ২৬৭]

এবং

"হে মুমিনগণ, তোমরা ঐসব সুস্বাদু বস্তু হারাম করো না, যেগুলো আল্লাহ্ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন"। [সূরা মায়ি'দাহ্: ৮৭]

এবং

"আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেসব বস্তু তোমাদেরকে দিয়েছেন, তন্মধ্য থেকে হালাল ও পবিত্র বস্তু খাও এবং আল্লাহ্-কে ভয় কর, যার প্রতি তোমরা বিশ্বাসী।" [সূরা আল-মায়ি'দাহ্: ৮৮]

এ আয়াত ও এজাতীয় অন্যান্য আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে যে, অর্থনৈতিক নীতির সাথে সম্পর্কিত ঐশী বাণী বা আহ্কামে শারী'আহ্'র লক্ষ্য হল সম্পত্তি অর্জন করা এবং উত্তম বস্তু ভোগ করা। সুতরাং ইসলাম ব্যক্তির উপর উপার্জনকে বাধ্যতামূলক করেছে এবং উপার্জিত সম্পদ থেকে ভোগ করার নির্দেশ দিয়েছে যাতে করে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয়, প্রত্যেকের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা যায় এবং তার বিলাসদ্রব্যের চাহিদা পূরণ করা যায়।

সম্পদ অর্জনকে সহজতর করার জন্য, আমরা দেখতে পাই যে, ইসলাম কোন জটিলতা ব্যতিরেকে সম্পদের মালিকানা অর্জনের জন্য পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন। সেটা সম্পদ অর্জনের পথকে সহজতর করেছে। ইসলাম মালিকানা লাভের বৈধ পথ ও মালিকানা হস্তান্তরের চুক্তিসমূহ সুসংজ্ঞায়িত করেছে এবং মানুষ যেসব রীতি ও উপকরণ প্রয়োগ করে উপার্জন করতে চায় সে ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়েছে এবং সম্পদ উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেনি।

বৈধ উপায়ে মালিকানা ও চুক্তি সম্পাদনের জন্য ইসলাম বিবিধ নীতিমালা এবং আইন সম্বলিত সাধারণ নির্দেশনা উপস্থাপন করেছে, যা বহু বিষয়ে প্রয়োগ করা যায় এবং যা থেকে কিয়াসের মাধ্যমে বহু হুকুম উৎসারিত করা যায়।

সুতরাং ইসলাম কাজকে বাধ্যতামূলক করেছে, এ বিষয়ে বিস্তারিত আইন প্রণয়ন করেছে, এবং মানুষকে বিভিন্ন পেশা- কাঠমিস্ত্রী, উৎপাদনকারী, কারিগর, ব্যবসায়ী প্রভৃতি হবার সুযোগ দিয়েছে। উপহারকে এমনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যার সাথে কিয়াসের মাধ্যমে দান বা আর্থিক সাহায্যকে মালিকানা প্রাপ্তির উপায় বলা যায়। কর্মসংস্থানকে এমনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যার সাথে কিয়াসের মাধ্যমে উকালতিকে তুলনা করা যায় ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির সাথে। সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে, মালিকানা লাভের উপায় এবং চুক্তিসমূহ সাধারণভাবে শারী'আহ্ বিস্তৃতভাবে উপস্থাপন করেছে এবং এমনভাবে স্থাপন করেছে যাতে করে অনেক সমসাময়িক বিষয়সমূহের সমাধানও এখান থেকে পাওয়া যায়, যদিও এগুলো নতুন কোন ধরনের লেনদেনকে অনুমোদন দেয় না। শারী'আহ্ সংজ্ঞায়িত পদ্ধতিতেই লোকদের লেনদেন করাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে যা নতুন অনেক ঘটনার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায়।

সুতরাং মুসলিমগণ সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে হালাল উপার্জনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এমন কোন বাঁধা ছাড়াই দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হবে। এভাবে সব ব্যক্তির জন্য মৌলিক অধিকার পূরণ করা সম্ভব। ইসলাম কেবলমাত্র ব্যক্তিকে উপার্জন করতে বলে না, বরং রাষ্ট্রের সব নাগরিকদের প্রয়োজনে বায়তুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগারকে দায়িত্বশীল হতে বলে। সেকারণে এটা শারীরিক ও মানসিকভাবে অক্ষম ব্যক্তির দায়িত্ব নেয়াকে রাষ্ট্রের কর্তব্য মনে করে। উম্মাহ্'র জন্য মৌলিক অধিকারের সংস্থান করা এর অন্যতম একটি দায়িত্ব মনে করে, কেননা রাষ্ট্র উম্মাহ্'র তত্ত্বাবধান করতে বাধ্য।

ইবনে উমর হতে বুখারী বর্ণনা করেছেন যে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন:

"ইমাম হলেন দায়িত্বশীল (রা'ঈ) এবং তিনি সব নাগরিকের জন্য দায়িত্বশীল।"

রাষ্ট্রের উপর শারী'আহ্ প্রদত্ত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে শারী'আহ্ রাষ্ট্রকে বিশেষ কিছু রাজস্ব আদায় করার দায়িত্ব অর্পণ করেছে, যেমন: জিযিয়া এবং খারাজ (ভূমিকর); যাকাতও রাষ্ট্রীয় কোষাগার বা বায়তুল মাল সংগ্রহ করে থাকে। উম্মাহ্'র উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্য রাষ্ট্রের অর্থ সংগ্রহের অধিকার রয়েছে, যেমন: রাস্তা সংস্কার, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা, দরিদ্র লোককে খাদ্য দেয়া এবং এ জাতীয় সবকিছু।

শারী'আহ্ গণমালিকানাধীন সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার দায়দায়িত্ব রাষ্ট্রকে অর্পণ করেছে। শারী'আহ্ ব্যক্তিকে গণমালিকানাধীন সম্পত্তি পরিচালনার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছে। কারণ সামগ্রিক দায়দায়িত্ব ইমামের এবং এ দায়দায়িত্ব ইমাম ছাড়া আর কোন সাধারণ নাগরিকের উপর বর্তায় না যদি না তিনি ইমাম কর্তৃক নিযুক্ত হন। পানি, তেল, লোহা, তামা, এবং এ জাতীয় গণমালিকানাধীন সম্পত্তি উম্মাহ্'র বা জাতির সমৃদ্ধির জন্য সদ্ব্যবহার করতে হবে। কারণ এ সম্পত্তির মালিক হল উম্মাহ্। রাষ্ট্র বরং এগুলোর প্রশাসনিক ও উন্নয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। যখন রাষ্ট্র তহবিল সরবরাহ করে এবং লোকদের বিষয়াদি তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করে, এবং যখন প্রত্যেক সামর্থ্যবান ব্যক্তি সম্পদ উপার্জন করে তখন ব্যক্তির মৌলিক অধিকার ও বিলাসসামগ্রীর চাহিদা পূরণের জন্য ব্যাপক সম্পদ সুলভ হয়ে যায়।

তাছাড়া, কাজের জন্য প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তিকে উদ্বুদ্ধ করা, রাষ্ট্রীয় মালিকানা নির্ধারণ এবং গণমালিকানাধীন সম্পত্তি বিনিয়োগ করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জিত হয়, এবং এসবই হচ্ছে চাহিদা পূরণের উপায়, সম্পত্তি পাওয়ার জন্য পাওয়া কিংবা দাম্ভিকতা কিংবা গুনাহ্'র কাজে ব্যয়ের জন্য কিংবা অহংকার এবং নির্যাতনের জন্য নয়। এজন্যই রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন:

"যে ব্যক্তি হালালভাবে এবং যথাযথ উপায়ে রিযিক অন্বেষণ করে, পরিবারের প্রতি উদার, প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতিশীল, সে পূর্ণ চাঁদের ন্যায় চেহারা নিয়ে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র সাথে দেখা করবে; এবং যে ব্যক্তি উদ্ধত্য ও বাহুল্যতার সাথে তা অন্বেষণ করবে সে আল্লাহ্'র সাথে যখন দেখা করবে তখন তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তার প্রতি রাগান্বিত থাকবেন।" আবু হুরায়রা (রা.) হতে ইবনে আবু শায়বা তার মুসান্নাফ-এ বর্ণিত করেছেন।

মুসলিম মুতার্‌রিফ-এর বরাত দিয়ে এবং মুতার্‌রিফ তার পিতার বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন: **"হে আদম সন্তান, তুমি যা খাও এবং ব্যয় করো, যা পরিধান করো এবং ফেলে দাও, এবং যা দান করো এবং নিজের জন্য রেখে দাও, তাছাড়া আর কি সম্পদ তোমার থাকতে পারে?"**

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

"অপব্যয় করো না। তিনি অপব্যয়ীদেরকে পছন্দ করেন না।" [সূরা আল-আ'রাফ: ৩১]

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানোই সম্পত্তি অর্জনের উদ্দেশ্য, অহংকার প্রদর্শনের জন্য নয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র হুকুম অনুসারে সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা করা বাধ্যতামূলক। এটা মানুষকে সে যা আয় করে সেগুলোর মাধ্যমে আখিরাতকে অন্বেষণ করার নির্দেশ দিয়েছে এবং বৈষয়িক বিষয়ে তার হিস্যার কথা ভুলে না যেতে বলেছে।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

"আল্লাহ্ তোমাকে যা দান করেছেন, তা দ্বারা পরকালের গৃহ অনুসন্ধান করো, এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না। তুমি অনুগ্রহ করো, যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়ো না।" [সূরা কাসাস: ৭৭]

ইসলামী অর্থনীতির দর্শন অনুসারে, সব অর্থনৈতিক কর্মকান্ডই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে, তাঁর প্রদত্ত নির্দেশ অনুয়ায়ী পরিচালিত হতে হবে। যে ধারণার উপর সমাজে মুসলিমদের বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত, তা হলো- একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীন বা ব্যবস্থা হিসেবে আহ্কামে শারী'আহ্ বা ঐশী হুকুম অনুসারে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে পরিচালনা করা। রাষ্ট্রের অন্য নাগরিকদের (অমুসলিম) অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ব্যবস্থাপনাও ঐশী হুকুমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এটা তাদেরকে এমন কিছুর অনুমোদন দেয় যা ইসলামে অনুমোদিত এবং সেটাকে নিষিদ্ধ করে যা ইসলামে নিষিদ্ধ।

আল্লাহ্ বলেন:

"রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো।" [সূরা হাশর: ৭]

এবং তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

"হে মানবকুল, তোমাদের কাছে উপদেশ বাণী এসেছে তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে এবং অন্তরের রোগের নিরাময়।" [সূরা ইউনুস: ৫৭]

এবং তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

"যারা তাঁর (রাসূল সা: এর) আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।" [সূরা নূর: ৬৩]

এবং তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

"আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তদানুযায়ী ফয়সালা করুন" [সূরা মায়ি'দাহ্: ৪৯]

তাক্বওয়ার ভিত্তিতে মুসলিমদের এই অর্থনৈতিক নীতির প্রতি আনুগত্যশীল থাকতে উদ্বুদ্ধ করে, এবং জনগণকে রাষ্ট্রীয় আইনের অধীনে নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে ইসলাম শারী'আহ্ প্রণীত এসব হুকুমসমূহের বাস্তবায়নকে নিরাপদ করে।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ করো, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো।" [সূরা আল-বাক্বারা: ২৭৮]

এবং তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

"হে মুমিনগণ! যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ঋণের আদান-প্রদান করো, তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও।" [সূরা বাক্বারা: ২৮২]

যতক্ষণ না তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

"... কিন্তু যদি কারবার নগদ হয়, পরস্পর হাতে হাতে আদান-প্রদান করো, তবে তা না লিখলে তোমাদের প্রতি কোন অভিযোগ নেই।" [সূরা বাক্বারা: ২৮২]

ইসলাম কীভাবে এ হুকুমসমূহ বাস্তবায়ন হবে সে পদ্ধতি বর্ণনা করেছে এবং কীভাবে লোকেরা এ হুকুমসমূহ নিশ্চিতভাবে গ্রহণ করবে তাও বিধৃত করেছে।

এটা প্রমাণ করে যে, ইসলামী অর্থনৈতিক নীতি একটি নির্দিষ্ট সমাজে বসবাসরত মানুষ হিসেবে প্রতিটি ব্যক্তির চাহিদা পূরণ ও সে চাহিদা পূরণের জন্য সম্পদ উপার্জনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে। ইসলামী অর্থনৈতিক নীতিও একটি চিন্তার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তা হলো সব কাজ ঐশী হুকুম অনুসারে বাস্তবায়ন করা। প্রত্যেক ব্যক্তিকে আল্লাহ্'র ভয় দ্বারা উদ্ধুদ্ধ করে এবং রাষ্ট্র কর্তৃক জনগণের বিকাশ প্রক্রিয়া ও আইন প্রয়োগের মাধ্যমে এটি বাস্তবায়িত হয়।

সাধারণ অর্থনৈতিক মূলনীতি

অর্থনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট ঐশী হুকুমসমূহ বিশ্লেষণ করলে এটা প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম লোকদের সম্পদের সদ্ব্যবহার করার লক্ষ্যে সমর্থ করে তোলার বিষয়টিকে নির্দেশ করেছে। সমাজের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এটাই হলো ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী। যখন অর্থনীতির কথা আসে তখন প্রাথমিকভাবে তা সম্পদ অর্জন, এর হস্তান্তর ও জনগণের মধ্যে তা বন্টনের কথা বলে।

অর্থনীতির সাথে বিজড়িত হুকুমসমূহ তিনটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত:

১. প্রাথমিক মালিকানা
২. মালিকানার হস্তান্তর (Disposal)
৩. এবং জনগণের মধ্যে সম্পদের বন্টন

মালিকানার ক্ষেত্রে সত্ত্বাধিকারী হলেন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। কেননা তিনি হলেন সমগ্র বিশ্বব্রহ্মান্ডের একচ্ছত্র অধিপতি (মালিক আল মুলক)। বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে তিনি ঘোষণা দিয়েছেন যে, সম্পত্তির মালিক হলেন তিনি।

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে, অর্থ-কড়ি দিয়েছেন, তা থেকে তাদেরকে দান করো।" [সূরা নূর: ৩৩]

সুতরাং সম্পত্তির একক মালিক হলেন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। তবে তিনি মানুষকে এগুলোর তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন, তাকে এটি দান করেছেন এবং মানুষকে এগুলোর মালিকানা লাভের অধিকার প্রদান করেছেন।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

"তিনি তোমাদেরকে যার উত্তরাধিকারী করেছেন, তা থেকে ব্যয় করো।" [সূরা হাদীদ: ৭]

এবং তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

"তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি বাড়িয়ে দিবেন"। [সূরা নূহ: ১২]

স্পষ্টতই যখন তিনি সম্পদের উৎস সম্পর্কে বলেন তখন এর মালিকানা নিজের উপরই অর্পণ করেন এবং তিনি বলেন:

"...আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে অর্থ-কড়ি দিয়েছেন..." [সূরা নূর: ৩৩]

অতঃপর আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষের কাছে সম্পত্তি হস্তান্তরের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন; তিনি তাদেরকে সম্পত্তি প্রদান করেছেন এবং বলেন:

"তাদের হাতে তাদের সম্পদ প্রত্যার্পণ করো।" [সূরা নিসা: ৬]

এবং

"তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ করো।" [সূরা তাওবা: ১০৩]

এবং

"তবে তোমরা নিজের মূলধন পেয়ে যাবে। " [সূরা বাক্বারা: ২৭৯]

এবং

"তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ" [সূরা তাওবা: ২৪]

এবং

"তখন তার সম্পদ তার কোনই কাজে আসবে না।" [সূরা আল-লাইল: ১১]

আল্লাহ্'র প্রতিনিধিত্বের দৃষ্টিকোন থেকে সম্পদের প্রতি সকল মানুষের মালিকানার অধিকার রয়েছে। তবে এটা সত্যিকারের মালিকানা নয়, বরং শুধুমাত্র মালিকানার অধিকার। একজন ব্যক্তির সত্যিকারের মালিকানা তখনই নিশ্চিত হয় যখন মালিকানার ইসলামী শর্তাবলী পূরণ হয়, অর্থাৎ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র অনুমোদন। সুতরাং সম্পত্তির সত্যিকারের মালিকানা তখনই সম্ভবপর হয়, যখন একজন ব্যক্তি কোন সম্পত্তি অর্জনের জন্য তার প্রভূর অনুমোদন পায়। এই অনুমোদন হলো একজন ব্যক্তি সম্পত্তির মালিক হতে পারে এ ব্যাপারে একটি সুনির্দিষ্ট দলিল। সমস্ত মানবজাতিকে মালিকানার স্বত্ব প্রদান করা আ'ম বা সাধারণ দলিল দ্বারা প্রমাণিত এবং এটা মালিকানার অধিকারকে প্রমাণ করে। একজন ব্যক্তিকে কোন সম্পত্তির সত্যিকারের মালিকানা প্রদান করার জন্য সুনির্দিষ্ট অনুমোদন প্রয়োজন যা ব্যক্তিকে আইনপ্রণেতা অর্থাৎ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা, প্রদান করেছেন।

আইনপ্রণেতা উল্লেখ করেছেন যে, ব্যক্তিগত মালিকানা সেখানেই কার্যকর যেখানে একজন ব্যক্তি আইনদাতা কর্তৃক অনুমোদিত মালিকানা লাভের পন্থার কোন একটির মাধ্যমে তা অধিকার করে থাকে। আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন:

"যে ব্যক্তি একটি দেয়ালের মাধ্যমে একখন্ড জমিকে ঘিরে ফেলে, এটি তার হয়ে যায়।"

এছাড়া পুরো উম্মাহ্'র মালিকানায় রয়েছে গণমালিকানাধীন সম্পত্তি। আহ্মাদ মুহাজীরদের এক ব্যক্তির কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"জনগণ তিনটি বিষয়ে অংশীদার: পানি, চারণভূমি ও আগুন।"

তাছাড়া রাষ্ট্রীয় মালিকানাও রয়েছে। যখন কোন ওয়ারিশ ছাড়া একজন মুসলিম মারা যান তখন তার সম্পত্তি রাষ্ট্রীয় কোষাগার বা বায়তুল মালে চলে যায়। খারাজ ও জিযিয়া থেকে যাই সংগৃহীত হবে, তাই কোষাগারের অংশ। রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির ব্যবহার রাষ্ট্রের এখতিয়ারভুক্ত।

ব্যক্তিগত, গণমালিকানাধীন এবং রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির মালিকানা লাভের প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট ইসলাম শারী'আহ্ হুকুমের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করেছে। এর বাইরে যে কোন প্রক্রিয়া নিষিদ্ধ।

সম্পত্তির মালিকানা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে জনগণের পক্ষ থেকে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্র গণমালিকানাধীন সম্পত্তির দায়িত্বভার গ্রহণ করে। তবে রাষ্ট্র কর্তৃক গণমালিকানাধীন সম্পত্তির দলিল কিংবা স্বত্বকে বিনিময় (Exchange) অথবা মঞ্জুর (Grant) ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। এ দু'টি বাদে অন্য যেকোন উপায়ে গণমালিকানাধীন সম্পত্তির হস্তান্তর অনুমোদিত এবং তা শারী'আহ্ হুকুমের ভিত্তিতে হতে হবে।

ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির হস্তান্তর বায়তুল মাল ও লেনদেনের সাথে সংশ্লিষ্ট হুকুমের মাধ্যমে করা হয়, যেমন: বিক্রয় করা বা বন্ধক রাখা। ইসলাম ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিকে শারী'আহ্ হুকুমের ভিত্তিতে বিনিময় (Exchange) অথবা মঞ্জুরের (Grant) মাধ্যমে হস্তান্তরের অনুমোদন দিয়েছে।

মালিকানা এবং চুক্তির মাধ্যমে জনগণের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে সম্পত্তির বন্টন করা হয়। মানুষের সামর্থ্য এবং তাদের প্রয়োজন মেটানোর প্রবণতার মধ্যে স্বাভাবিক পার্থক্যের দরুণ তাদের মাঝে সম্পত্তির বন্টনের ক্ষেত্রে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এর ফলে বৈষম্যপূর্ণ বন্টন হতে পারে এবং সম্পদ সামান্য কিছু লোকের কাছে কুক্ষিগত হয়ে অন্যরা বঞ্চিত হতে পারে। স্বর্ণ ও রৌপ্য মজুতের ঘটনাও ঘটতে পারে, যা মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম। সেকারণে ইসলাম কেবলমাত্র ধনীদের মাঝে সম্পদ আবর্তিত হওয়াকে নিষিদ্ধ করেছে। বরং ইসলাম বাস্তবিকভাবে সম্পদ সবার মধ্যে আবর্তিত হওয়াকে বাধ্যতামূলক করেছে। ইসলাম স্বর্ণ ও রৌপ্য মজুত করাকে নিষিদ্ধ করেছে, এমনকি এর উপর যাকাত প্রদান করা হলেও।

অধ্যায় ৩: মালিকানার প্রকারভেদ (ব্যক্তি মালিকানা)

মানষের স্বাাভাবিক প্রবনতা হচ্ছে, সে তার অভাব পরণের জন্য কাজ করতে চায় ও সম্পদের অধিকারী হতে চায় এবং এই সম্পদ অর্জনের লক্ষ্যে সে জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। মানুষের অভাব পূরণ একটি অপরিহার্য বিষয়, যা থেকে নিজেকে সে নিবৃত্ত রাখতে পারে না। এছাড়াও, মানুষের প্রকৃতির অংশ হিসেবে সম্পদ অর্জনের বিষয়টিও অনিবার্য হয়ে পড়ে। সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা ও এর পরিমাণকে সীমাবদ্ধ করে দেয়ার যে কোন প্রচেষ্টা মানুষের প্রকৃতির সাথে সাংঘর্ষিক হবে। অতএব, মানুষ ও তার সম্পদ অর্জনের স্পৃহায় বাধা সৃষ্টি করা কিংবা ব্যক্তি ও তার সম্পদ সংগ্রহের প্রচেষ্টার মাঝে অবস্থান নেয়া প্রকৃতি বিরুদ্ধ হবে।

যাই হোক, সম্পদ অর্জন, এই উদ্দেশ্যে কঠোরভাবে প্রচেষ্টা করা কিংবা এর বিলিব্যবস্থার বিষয়টি মানুষের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া উচিত নয়, কেননা এটি অনিষ্ট ও দুর্নীতির কারণ হতে পারে যা নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার জন্ম দিতে পারে। সক্ষমতা এবং প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ থাকার দরুন এই বিষয়টি অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। যদি এ বিষয়টি তাদের নিজেদের উপর ছেড়ে দেয়া হয় তবে শুধুমাত্র ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা সম্পদ অর্জন করতে পারবে এবং দুর্বল ব্যক্তিরা বঞ্চিত হবে, অসুস্থ ও অসমর্থ্য ব্যক্তিরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এবং লোভীর সংখ্যা মাত্রাতিরিক্তভাবে বেড়ে যাবে। অতএব, সম্পদ অর্জন এবং এই উদ্দেশ্যে সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার বিষয়টি এমন প্রক্রিয়ায় হতে হবে যাতে করে তা সকল মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারে। এই প্রক্রিয়াটির এটিও নিশ্চিত করতে হবে যে, মানুষের মধ্যে বিলাস-দ্রব্যাদি অর্জনের যে আকাঙ্খা রয়েছে তাও পূরণ করা সম্ভবপর হয়। একারণে এই সম্পদ অর্জনের বিষয়টিকে একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়া উচিত যার মাধ্যমে সক্ষমতা ও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ থাকা সত্ত্বেও সকলে সহজে সম্পদ অর্জন করতে পারে। এই পদ্ধতিটি মানুষের প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে যাতে করে মানুষ তার মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণ করতে পারে এবং মানুষকে তার বিলাস সামগ্রী অর্জনের আকাঙ্খা পূরণেও সক্ষম করে তোলে। সুতরাং, সম্পদের প্রকৃতি অনুসারে মালিকানা নির্ধারণ করা জরুরী এবং মালিকানা রহিতকরণের বিষয়টি প্রতিহত করা অপরিহার্য, কারণ এটি মানুষের প্রকৃতির সাথে সাংঘর্ষিক। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের মালিকানাই কেবল অর্জন করা যাবে – এ বিষয়টিও রোধ করা জরুরী, কেননা এটা মানুষকে সম্পদ অর্জনের প্রচেষ্টা থেকে বিরত রাখে যা মানব প্রকৃতির সাথে সাংঘর্ষিক। মালিকানার স্বাধীনতাকেও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, কেননা এর মাধ্যমে পাপ ও দূর্নীতির জন্ম হয় যা মানুষের মধ্যে বিস্তার লাভ করে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্পর্কের সূত্রপাত করে। ইসলাম ব্যক্তি পর্যায়ের মালিকানাকে অনুমোদন দেয় এবং এর পরিমাণ নির্ধারণ না করে মানুষের প্রকৃতি অনুসারে এটি অর্জনের প্রক্রিয়াকে সুনির্দিষ্ট করে দেয়। এটা মানুষের মধ্যকার সম্পর্কগুলোকে সুসংগঠিত করে যাতে করে মানুষ তার অভাবসমূহ পূরণ করতে পারে।

ব্যক্তি মালিকানার সংজ্ঞা

ব্যক্তি মালিকানার বিধান হচ্ছে একটি ঐশী হুকুম যা সম্পদ কিংবা প্রাপ্ত উপযোগের ভিত্তিতে বিবেচিত হয়, সম্পদের মালিককে সম্পদ সদ্ব্যবহারের এবং এর ক্ষয়ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার প্রদান করে। উদাহরণস্বরুপ: এটা হতে পারে এক টুকরো রুটি ও একটি বাড়ীর উপর কোন ব্যক্তির মালিকানা। রুটির টুকরোর মালিকানার মাধ্যমে সে এটি খেতে পারে বা বিক্রয় করতে পারে। একইভাবে বাড়ীর মালিকানার মাধ্যমে সে তাতে বসবাস করতে পারে বা বিক্রয় করে দিতে পারে। দু'টি উদাহরণের ক্ষেত্রেই এক টুকরো রুটি ও বাড়ী সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এগুলোর ব্যাপারে ঐশী হুকুম হচ্ছে যে, আইনপ্রণেতা এগুলো ভোগ করার মাধ্যমে প্রাপ্ত উপযোগ বা বিনিময়ের মাধ্যমে কাজে লাগানোর অনুমোদন দিয়েছেন। সদ্ব্যবহারের অনুমোদনের অর্থ হল মালিক রুটির টুকরোটি ভক্ষণ করতে পারে ও বাড়ীতে বসবাস করতে পারে এবং চাইলে বিক্রিও করে দিতে পারে। সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত রুটির টুকরোর ক্ষেত্রে শারী'আহ্ হুকুম হচ্ছে যে এটিকে ভোগ করার অনুমোদন রয়েছে। বাড়ীর ক্ষেত্রে শারী'আহ্ হুকুমটি বিবেচিত হয় বাড়ী হতে প্রাপ্ত উপযোগ দ্বারা, আর তা হচ্ছে এতে বসবাসের অনুমোদন। সুতরাং মালিকানা বলতে বুঝায় সম্পত্তির সদ্ব্যবহার করার জন্য আইনপ্রণেতার অনুমোদন। এই দৃষ্টিকোন অনুযায়ী, যদি আইনপ্রণেতা এটিকে এবং এর উপকরণকে অনুমোদন না দেয় তবে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে না। সম্পত্তির মালিকানা লাভের অধিকার সম্পত্তি হতে কিংবা এর উপকারী বা ক্ষতিকর বৈশিষ্ট্য হতে উদ্ভুত হয় না। বরং এটি আইনপ্রণেতার অনুমোদন হতে এবং কোন একটি সম্পদ আইনসঙ্গতভাবে অর্জনের পন্থাগুলোর ক্ষেত্রে তাঁর (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) প্রদত্ত বৈধতা হতে উদ্ভুত হয়। এর মাধ্যমে আইনপ্রণেতা কিছু জিনিসের মালিকানার অধিকার প্রদান করেছেন এবং অন্যান্য জিনিসের মালিকানা অর্জনকে নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) কিছু চুক্তিকে বৈধতা দিয়েছেন এবং অন্যগুলোকে নিষিদ্ধ করেছেন। একারণে আইনপ্রণেতা মুসলিমদের জন্য মদ ও শূকরের মালিকানা নিষিদ্ধ করেছেন এবং সুদ ও জুয়ার মাধ্যমে সম্পদ অর্জনকে ইসলামী রাষ্ট্রের যেকোন নাগরিকের জন্য অবৈধ ঘোষণা করেছেন। তিনি (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) বেচাকেনাকে অনুমোদনের মাধ্যমে একে হালাল করেছেন এবং সুদকে নিষিদ্ধ, অর্থাৎ হারাম ঘোষণা করেছেন। তিনি 'আনান (ব্যক্তি ও আর্থিক অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কারবার)-এর অনুমোদন দিয়েছেন এবং সমবায়, যৌথমূলধনী কারবার ও বীমাকে নিষিদ্ধ করেছেন।

বৈধ মালিকানা শর্তসাপেক্ষ এবং এটি হস্তান্তরে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। মালিকানা কোন সম্প্রদায়ের স্বার্থ কিংবা সম্প্রদায়ের অংশ ও সমাজে বসবাসরত কোন ব্যক্তির স্বার্থে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। মালিকানাপ্রাপ্ত কোন সম্পত্তি সদ্ব্যবহারের বিষয়টি কেবলমাত্র আইনপ্রণেতার অনুমোদনের মাধ্যমেই আসতে পারে যা তিনি ওহীর মাধ্যমে মানুষকে দান করেছেন। কোন একটি বস্তুর মালিকানা হল সমাজের কোন ব্যক্তির জন্য আইনপ্রণেতা কর্তৃক প্রদত্ত বরাদ্দ, এবং অনুমোদিত পন্থাগুলো ছাড়া অন্য কোনভাবে তার জন্য এর মালিকানা অর্জন বৈধ নয়।

কোন সম্পদের মালিকানার অর্থ হল সম্পত্তির এবং সেটা থেকে প্রাপ্ত উপযোগের মালিকানা লাভ করা। মালিকানার প্রকৃত উদ্দেশ্য হল শারী'আহ্ নিধারিত পথে সম্পত্তির সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা।

ব্যক্তি মালিকানার সংজ্ঞার আলোকে এটা বুঝা যায় যে, মালিকানা অর্জনের আইনগত পন্থা রয়েছে। এটাও বুঝা যায় যে, এই মালিকানা হস্তান্তরের জন্য এবং স্বত্বাধিকারে থাকা বস্তুসমূহ সদ্ব্যবহারের জন্যও সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে।

অতএব, উপরোক্ত আলোচনা হতে যেসব বিষয় ব্যক্তি মালিকানার অধিকারের সাথে সাংঘর্ষিক হিসেবে বিবেচিত হয় সেগুলো বোঝা যেতে পারে। সুতরাং, আইনপ্রণেতা কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে মালিকানা অর্জিত হওয়ার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে- অধিকার লাভ করার জন্য এবং সেই সাথে এর সদ্ব্যবহারের জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালানো, আর এটিকেই মালিকানার প্রকৃত সংজ্ঞা হিসেবে গণ্য করা হয়। ভিন্ন শব্দে বলা যায় যে, মালিকানার প্রকৃত সংজ্ঞাই মালিকানার প্রকৃত অর্থ নির্দেশ করে।

মালিকানার অর্থ

ব্যক্তি মালিকানার অধিকার হচ্ছে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির মালিকানার অধিকারী ব্যক্তির আইনগত অধিকার। আইন প্রয়োগ ও সমাজকে ইসলামী চিন্তার ভিত্তিতে গড়ে তোলার মাধ্যমে এই অধিকার সংরক্ষিত ও নির্ধারিত হয়। শারী'আহ্ কর্তৃক নির্ধারিত আর্থিক মূল্য বহনের পাশাপাশি মালিকানার অধিকার এটাও নির্দেশ করে যে, দখলে থাকা অর্জিত সম্পত্তির উপরে ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। যেভাবে নিজের ঐচ্ছিক কর্মকান্ডের উপর ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, ঠিক একইভাবে সে চাইলে তার নিজের অধিকারে থাকা সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারে। অতএব, মালিকানার অধিকার আল্লাহ্ (সুব্হানাহু ওয়া তাআ'লা) প্রদত্ত হুকুম ও নিষেধাজ্ঞার সীমার মধ্যেই নির্ধারিত হয়।

মালিকানার অধিকার নির্ধারনকারী আইনী প্রক্রিয়ায় মালিকানা নির্ধারণের বিষয়টি সুস্পষ্ট এবং এর দ্বারা শাস্তির প্রয়োগ হবে কি হবে না সেই সিদ্ধান্তও নেয়া হয়। এর উদাহরণ হল চৌর্যবৃত্তি, ডাকাতি ও অবৈধভাবে সম্পত্তি হরণের সংজ্ঞা। এই মালিকানা নির্ধারণের বিষয়টি মালিকানা হস্তান্তরের অধিকারের মধ্যেও সুস্পষ্ট, এতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হস্তান্তর অনুমোদিত ও অন্যান্য কিছু ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ এবং এসব ঘটনার সংজ্ঞায় ও ক্ষেত্রসমূহের প্রকারভেদ ও বহিঃপ্রকাশের মধ্যেও এটি সুস্পষ্ট। যখন ইসলাম মালিকানা নির্ধারণ করে, তখন তা পরিমাণের ভিত্তিতে করা হয় না বরং এর ধরনের বা প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে করা হয়। নিম্নলিখিত বিষয়গুলোতে এটা পরিষ্কার হয়েছে:

১. কী পরিমাণ সম্পদ অর্জিত হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে নয় বরং ইসলামে মালিকানা নির্ধারিত হয় সম্পদ অর্জন ও বিনিয়োগের পন্থার ভিত্তিতে।
২. এটি সম্পদ হস্তান্তরের প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে দিয়েছে।
৩. খারাজী ভূমি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন, ব্যক্তি মালিকানাধীন নয়।
৪. কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি গণমালিকানাধীন সম্পত্তিতে রূপান্তর হয়ে যেতে পারে।
৫. অভাব পূরণের জন্য যেসব মানুষের যথেষ্ট সম্পদ নেই সেসব মানুষদেরকে রাষ্ট্র প্রয়োজনের নিরিখে অনুদান প্রদান করতে পারে।

এটা অপরিহার্য যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানার আইনগত অধিকারসমূহ নিশ্চিত করার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ থাকা প্রয়োজন। আইন ব্যক্তিপর্যায়ের মালিকানার অধিকারকে সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর অর্পণ করেছে। এটি মালিকানার মর্যাদা, সুরক্ষা ও এর প্রতি আগ্রাসনকে প্রতিহত করার বিষয়গুলোকে সুনিশ্চিত করেছে। আইনের মধ্যে শাস্তির বিধান রেখে অপরাধকে নিরুৎসাহিত করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করেছে, এবং যারা চুরি, ডাকাতি অথবা অন্য কোনভাবে এই অধিকার লঙ্ঘন করে তাদের উপর এটি পয়োগ করা হয়। সমাজকে ইসলামী চিন্তার ভিত্তিতে গড়ে তোলার প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ে এই বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় যাতে মানুষ তার অধিকার বহির্ভূত উপায়ে কোন কিছু অর্জনের বাসনা পোষণ না করে, অর্থাৎ যা অন্যের অধিকারে আছে তার দিকে লালসার দৃষ্টি প্রসারিত না করে। সুতরাং, হালাল বা বৈধ সম্পত্তি হিসেবে সেটাই বিবেচিত হবে যা মালিকানার সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে এবং কোন অবৈধ (হারাম) সম্পত্তি মালিকানার অধীনে আসবে না ও এটি মালিকানার সংজ্ঞার মধ্যেও পড়ে না।

সম্পত্তির মালিকানা লাভের পন্থা

যা অধিকারে নেয়া যায় তাই সম্পদ, এক্ষেত্রে এর প্রকৃতি কোন বিবেচ্য বিষয় নয়। সম্পদ অর্জনের পন্থাগুলোই হচ্ছে সেই কারণ যা প্রারম্ভিক পর্যায়ে ব্যক্তিকে সম্পত্তির মালিকানা প্রদান করে। কোন প্রকারের বিনিময়কে সম্পদের মালিকানা লাভের পন্থা হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। এটি শুধুমাত্র সম্পত্তির অংশবিশেষ হিসেবে কোন পণ্য প্রদানের মাধ্যমে আরেকটি পণ্যের মালিকানা অর্জনের উপায়, আর এক্ষেত্রে সম্পত্তি মূলতঃ অর্জিতই থাকে এবং এর কিছু অংশবিশেষের বিনিময় হয়। সম্পদ বিনিয়োগ, যেমন: ব্যবসার লভ্যাংশ, বাড়ীর ভাড়া, কিংবা ফসল – এগুলোও একইভাবে সম্পদ অর্জনের পন্থা হিসেবে বিবেচিত হয় না। যদিওবা এই বিনিয়োগের মাধ্যমে নতুন কিছু সম্পদের সৃষ্টি হচ্ছে তথাপি এই সম্পদ অন্য একটি সম্পত্তি থেকে উৎপন্ন হয়েছে, সুতরাং বিনিয়োগ হচ্ছে সম্পদ বৃদ্ধির একটি পন্থা, সম্পদ অর্জনের পন্থা নয়। আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সম্পদের প্রারম্ভিক মালিকানা অর্জন, ভিন্ন শব্দে: প্রকৃত সম্পদ অর্জন।

মালিকানা অর্জনের উপায় এবং ইতিমধ্যেই মালিকানাধীন সম্পত্তি বিনিয়োগের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে: প্রকৃত সম্পত্তি আহরণের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে সম্পদ অর্জন বা অধিকার করাই হল মালিকানা অর্জন। অন্যদিকে, মালিকানাধীন সম্পত্তি বিনিয়োগের অর্থ হল অধিকারে বা দখলে থাকা সম্পত্তি বৃদ্ধি পাওয়া। এক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই সম্পত্তি অধিকারে বা দখলে রয়েছে, তবে তা বিনিয়োগ করা হয়েছে এবং বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্পদ অর্জন এবং মালিকানাধীন সম্পত্তির বিনিয়োগ – উভয়ের ব্যাপারে শারী'আহ্ হুকুম বিদ্যমান। বিক্রয় ও ইজারা চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট হুকুমসমূহ বিনিয়োগের সাথে সম্পর্কিত এবং শিকার ও নীরব অংশীদারিত্বের মত কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট হুকুমসমূহ সম্পত্তির মালিকানা অর্জনের সাথে সম্পর্কিত। একইভাবে, মালিকানা অর্জনের পন্থাগুলোই প্রকৃত সম্পদ অর্জনের মাধ্যম। আর মালিকানায় থাকা সম্পত্তি বিনিয়োগের পন্থাগুলোই সম্পদ বৃদ্ধির মাধ্যম, যা ইতিমধ্যেই মালিকানা লাভের কোন একটি পন্থার মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে।

সম্পদের মালিকানার জন্য ঐশী কারণ বিদ্যমান, যা আইনপ্রণেতা সুনির্দিষ্ট কিছু উপায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। এই কারণসমূহের ক্ষেত্রে সীমালংঘন করা যাবে না। অতএব, সম্পদের মালিকানা অর্জনের পন্থাগুলো শারী'আহ্ প্রদত্ত হুকুমের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সম্পদ অথবা প্রাপ্ত উপযোগের ভিত্তিতে বিবেচিত সুনির্ধারিত হুকুম বা হুকুম শারী'আহ্ হিসেবে পূর্বে উল্লেখিত সম্পত্তির সংজ্ঞানুসারে সম্পদের মালিকানা লাভের জন্য আইনপ্রণেতার অনুমোদন প্রয়োজন। অন্য কথায়, মালিকানা অর্জনের জন্য অনুমোদিত পন্থাটি শারী'আহ্র মধ্যে উল্লেখ থাকতে হবে। যদি মালিকানা লাভের বৈধ পন্থা অনুসৃত হয়ে থাকে তবে সম্পত্তির মালিকানা বিদ্যমান থাকবে এবং যদি মালিকানা অর্জনের বৈধ পন্থা না থাকে তবে সম্পত্তির মালিকানার অস্তিত্বও থাকবে না, যদিওবা একজন ব্যক্তি সেই সম্পদের মালিক হয়ে থাকে। অতএব, মালিকানা হল আইনপ্রণেতা কর্তৃক অনুমোদিত ঐশী পন্থার মাধ্যমে কোন সম্পত্তি অধীনে থাকা। শারী'আহ্ মালিকানা লাভের উপায়কে অনিয়ন্ত্রিত নয়, বরং সুনির্দিষ্টভাবে পরিষ্কার কিছু পন্সার দ্বারা নিধারিত করে দিয়েছে। শারী'আহ সুস্পষ্ট নীতিমালার মাধ্যমে এই পন্থাগুলো তুলে ধরেছে। অনেকগুলো অধ্যায়ের সমন্বয়ে এগুলো গঠিত হয়েছে, আর এ অধ্যায়গুলো হচ্ছে এই পন্থাগুলোর শাখা-প্রশাখা ও হুকুমসমূহ সুস্পষ্টকরণের জন্য প্রদত্ত ব্যাখ্যা। শারী'আহ্ এই পন্থাগুলোকে কিছু সাধারণ মানদন্ড দ্বারা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেনি, সুতরাং অন্য কোন সাধারণ পন্থাকে সাদৃশ্যতার ভিত্তিতে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। এটা একারণে যে, নতুন চাহিদা শুধুমাত্র উৎপাদিত সম্পদের উপর, লেনদেনের উপর নয়; অর্থাৎ সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণকারী ব্যবস্থার মধ্যে এটি অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং এটা সম্পর্কের উপজীব্য বিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। অতএব, লেনদেনকে সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা জরুরী যা নতুন ও বিভিন্ন ধরনের চাহিদার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, এছাড়াও এটিকে সম্পত্তির ক্ষেত্রে সম্পদ হিসেবে ও কাজের ক্ষেত্রে কাজ হিসেবে প্রয়োগ করা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী ব্যক্তি মালিকানাকে এমনভাবে নিরূপণ করে যা মানুষের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এটি এমনভাবে মালিকানাকে সুসংগঠিত করে যাতে মালিকানা অর্জনের পন্থা অনিয়ন্ত্রিত রাখার ফলে উদ্ভুত বিপদ হতে সমাজকে সুরক্ষিত রাখা যায়। বেঁচে থাকার প্রবৃত্তির একটি দিক হলো ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জনের আকাঙ্খা, যেমনিভাবে যৌন প্রবৃত্তির একটি দিক হলো বিয়ে এবং সৃষ্টিকর্তার কাছে আত্মসমর্পনের প্রবৃত্তির একটি দিক হলো উপাসনার আচার-আনুষ্ঠানাদি। যদি প্রবৃত্তির এসব দিকগুলোকে যথেচ্ছভাবে পূরণ করতে দেয়া হয় তবে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে এবং মানুষ সেগুলোকে অস্বাভাবিক ও ভুলপথে পূরণ করার দিকে ধাবিত করবে। অতএব, যে পন্থায় মানুষ সম্পদ অর্জন করবে সেটি নির্ধারণ করে দেয়া জরুরী, যাতে করে উম্মাহ্'র ছোট একটি অংশ সম্পত্তির উপকরণ ব্যবহার করে উম্মাহ্'কে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে এবং অধিকাংশ জনগণ যেন তাদের চাহিদা পূরণে বঞ্চিত না হয়; এবং সম্পদ যাতে কেবলমাত্র সম্পদ আহরণের নিমিত্তেই উপার্জিত না হয়, অন্যথায় মানুষ সুখকর জীবন হারিয়ে ফেলবে; আর একারণে কেবলমাত্র সঞ্চয় করার জন্য মানুষ সম্পদ অর্জন করলে তা প্রতিহত করা হবে। একইভাবে, সম্পদের মালিকানা লাভের পন্থাগুলোও নির্ধারিত করে দেয়া প্রয়োজন। সম্পদের মালিকানা সংক্রান্ত আহ্কামে শারী'আহ্ বা ঐশী বাণী পর্যবেক্ষণ করলে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, মালিকানা অর্জনের পন্থাগুলোকে ৫টি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে:

১. কাজ।
২. উত্তরাধিকার।
৩. জীবন ধারণের জন্য সংগৃহীত সম্পদ।
৪. নাগরিকদের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত সম্পদ।
৫. সম্পত্তি বিনিময় বা কাজ ব্যতিরেকে ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত সম্পদ।

অধ্যায় ৪: মালিকানা লাভের প্রথম উপায়: কাজ ('আমাল)

যেকোন ধরনের সম্পত্তি নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে সেগুলো অর্জনের জন্য কাজ করা প্রয়োজন, এক্ষেত্রে সম্পত্তিসমূহ প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া যেতে পারে, যেমন: মাশরুম, কিংবা সেগুলো মানুষের শ্রম দ্বারা তৈরী হতে পারে, যেমন: এক টুকরো রুটি বা একটি গাড়ি।

'আমাল (কাজ) শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যার অনেকগুলো ধরন ও রূপ এবং ভিনড়ব ভিনড়ব ফলাফল বিদ্যমান। সেজন্য শারী'আহ্ 'আমাল বা কাজ শব্দটিকে সংজ্ঞায়িত করা ব্যতিরেকে এটির প্রচলিত ধ্রুপদী অর্থের উপর ছেড়ে দেয়নি। এছাড়াও, শারী'আহ্ 'আমাল শব্দটিকে সাধারণভাবে সংজ্ঞায়িত করেনি, বরং বিশেষ কিছু কাজ হিসেবে এটিকে উপস্থাপিত করেছে। এটি কাজের প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করেছে এবং সেগুলোই মালিকানা অর্জনের উপায় হিসেবে অনুমোদিত হয়েছে। কাজ সম্পর্কিত ঐশী হুকুমসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সম্পত্তি অর্জনের উপায় হিসেবে আইনগতভাবে বৈধ কাজসমূহ নিম্নরূপ:

১. অব্যবহৃত (নিষ্ফলা) ভূমির চাষাবাদ
২. ভূ-গর্ভে বা বাতাসের মধ্যে যা পাওয়া যায় তা আহরণ করা
৩. শিকার
৪. দালালি (সামসারা) এবং কমিশন এজেন্ট (দালালা)
৫. শ্রম ও মূলধনের ভিত্তিতে অংশীদারিত্ব (মুদারাবা)
৬. বর্গাচাষ (মুসাকাত)
৭. পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অন্যের জন্য কাজ করা

নিষ্ফলা জমিতে চাষাবাদ (ইহ্ইয়া উল-মাওয়াত)

নিষ্ফলা জমি (মাওয়াত) হলো এমন এক ধরনের ভূমি যার কোন মালিক নেই এবং যা থেকে কেউ উপযোগ লাভ করছে না। এতে চাষাবাদের অর্থ হলো বৃক্ষরোপন করা, বনায়ন করা বা এর উপর ইমারত নির্মাণ করা। ভিনড়বভাবে বলা যায় যে, জমিটির যে কোন প্রকারের ব্যবহারের অর্থই হলো সেটিকে আবাদ করা (ইহ্ইয়া)। কেউ এ ধরনের ভূমি আবাদ করলে সে এর মালিক হিসেবে পরিগণিত হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন:

"যে ব্যক্তি কোনো নিষ্ফলা জমিতে আবাদ করবে সেটি তার হয়ে যাবে।"

তিনি (সাঃ) আরও বলেছেন:

"যে ব্যক্তি কোন একটি ভূমিকে বেড়া দ্বারা ঘেরাও করে ফেলে সেটি তার।"

এবং, তিনি (সাঃ) বলেছেন:

"অন্য কোন মুসলিমের পূর্বে যে কেউ কোন কিছুর উপর হাত রাখলে সেটা তার হয়ে যাবে।" এক্ষেত্রে একজন মুসলিম ও জিম্মীর (ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক) মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কেননা এ হাদিসটি কোন ধরনের সীমাবদ্ধতা ছাড়া অর্থগত দিক থেকে পূর্ণাঙ্গ; এবং যেহেতু একজন জিম্মী উপত্যকা, বন এবং পাহাড়ের উপর থেকে যাই গ্রহণ করুক না কেন সেটি তারই, সেহেতু সেগুলো তার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া অনুমোদিত নয়। নিষ্ফলা জমি তার সম্পত্তি হওয়ার ক্ষেত্রেও হাদিসটি প্রযোজ্য। সব ভূমির ক্ষেত্রেই এই নিয়ম সাধারণভাবে প্রযোজ্য – হোক সেটা দারুল ইসলাম বা দারুল হারব্, কিংবা উশরী বা খারাজী ভূমি। তবে মালিকানা লাভের শর্ত হলো যে, জমিটি অধীনে আসার পর তিনবছরের মধ্যে সেটিতে কাজ করতে হবে এবং ব্যবহারের মাধ্যমে জমিটির আবাদ অব্যাহত রাখতে হবে। যদি কেউ জমি অধিকারে আসার প্রম তিন বছরের মধ্যে আবাদ না করে, বা পরবর্তীতে টানা তিন বছর ব্যবহার না করে তবে সে সেটির মালিকানার অধিকার হারাবে। উমর বিন আল-খাত্তাব (রা.) বলেছেন: "কোন ব্যক্তি জমিতে বেড়া দিয়ে মালিকানা অর্জন করতে পারে, তিন বছর পর্যন্ত অনাবাদী রাখলে সে জমিটির মালিকানা হারাবে।" অন্যান্য সাহাবাদের (রা.) উপস্থিতিতে উমর (রা.) এই উক্তি করেছিলেন এবং এই আইন প্রয়োগ করেছিলেন, সাহাবীরা (রা.) এ ব্যাপারে কোন আপত্তি করেননি – যা তাদের ইজ্মাকে সুনিশ্চিত করে।

ভূগর্ভে যা আছে তা আহরণ

আরেক প্রকারের কাজ হচ্ছে ভূ-গর্ভ হতে এমন ধরনের সম্পদ আহরণ করা যা কোন সম্প্রদায়ের টিকে থাকার নিয়ামক নয়, এগুলো লুক্কায়িত বা গুপ্তধন হিসেবে পরিচিত (রিকায্)। ফিকহ্-এর ব্যবহৃত পরিভাষা অনুসারে এ ধরনের সম্পদে মুসলিমদের সামষ্টিক কোনো অধিকার থাকে না। বরং, যদি কেউ কোন গুপ্তধন খুঁজে পায় তবে সেটার চার-পঞ্চমাংশ ঐ ব্যক্তির এবং অবশিষ্ট এক-পঞ্চমাংশ যাকাত হিসেবে গণ্য হবে।

তবে এটি যদি কোনো সম্প্রদায়ের সকল মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় হয় এবং সামষ্টিকভাবে মুসলিমদের অধিকার হয় তাহলে এটি গণমালিকানাধীন সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হবে। যা এই বিষয়টিকে সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করে তা হলো, যদি কোনো সম্পদ মানুষ যমিনে লুকিয়ে রাখে, কিংবা এর পরিমাণ

এতো সামান্য যে তা সম্প্রদায়ের প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট নয়, তবেই এটি গুপ্তধন হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে যা আদতে ভূ-গর্ভস্থ ছিল এবং সম্প্রদায়ের সকলের প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, তা রিকায্ নয় বরং গণমালিকানাধীন সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে, যা সত্যিকারভাবে মাটিতে পাওয়া যায় এবং সকলের জন্য প্রয়োজনীয় নয়, যেমন: পাথরের খনি, যা থেকে দালান নির্মানের পাথর এবং এজাতীয় কোন কিছু তৈরী হয়, তা রিকায্ বা গণমালিকানাধীন সম্পত্তি কোনটি হিসেবেই বিবেচিত হবে না, বরং তা ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হবে। রিকায্-এর মালিকানা লাভ এবং এর এক-পঞ্চমাংশ যাকাত হিসেবে প্রদানের বাধ্যবাধকতার বিষয়টি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, আমর ইবনে শু'য়াইব তার পিতার কাছ থেকে ও তার পিতা তার দাদার কাছ থেকে আল-নিসাইতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্'কে (সাঃ) লুকাতাহ্ (যা মাটি থেকে সংগৃহীত হয়) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি (সাঃ) বলেন:

"যদি এটা কোনো ব্যবহৃত রাস্তা বা মানববসতিপূর্ণ গ্রাম থেকে সংগৃহীত হয়ে থাকে তাহলে তোমাকে এ ব্যাপারে বর্ণনা দিতে হবে এবং ঘোষণা দিয়ে একবছর কাল অপেক্ষা করতে হবে। যদি এর মালিক একে শনাক্ত করতে পারে তাহলে এটি তার জিম্মায় চলে যাবে, অন্যথায় এটি তোমার। আর যদি এটি কোন ব্যবহৃত রাস্তা বা মানববসতিপূর্ণ গ্রাম থেকে সংগৃহীত না হয় তাহলে এটির এক-পঞ্চমাংশ যাকাত হিসেবে দিতে হবে এবং গুপ্তধনের (রিকায্) ক্ষেত্রেও একই বিষয়।"

অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেনের মতো বাতাসে মিশে থাকা কোন কিছু সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে বলা যায় যে, সেগুলোকে ভূ-গর্ভস্থ হতে উৎপাদিত বস্তুসমূহের মতো একইভাবে বিবেচনা করা হয়। আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা কর্তৃক সৃষ্ট যে জিনিসকে শারী'আহ্ মুবাহ্ ঘোষণা করেছে এবং যেটির ব্যবহার সীমাবদ্ধ করে দেয়নি সেটির ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য।

শিকার

শিকার করা হচ্ছে আরেক ধরনের কাজ। মাছ, মুক্তা, প্রবাল, স্পঞ্জ (এক প্রকার সামুদ্রিক প্রাণী) এবং অন্যান্য শিকার হওয়া প্রাণীর মালিকানা লাভ করবে শিকারী; পাখি বা পশু, কিংবা যমিন হতে শিকার করা কোন কিছুর মালিকও হবে শিকারকারী ব্যক্তি। আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

"তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও সমুদ্রের খাদ্য হালাল করা হয়েছে তোমাদের উপকারার্থে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এহ্রামরত অবস্থায় থাক ততক্ষণ পর্যন্ত হারাম করা হয়েছে স্থল শিকার।" [সূরা মায়িদাহ্ : ৯৬]

এবং তিনি (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"যখন তোমরা এহ্রাম ভেঙ্গে ফেল, তখন তোমাদের জন্য শিকার করা অনুমোদিত।" [সূরা মায়িদাহ্: ২]

এবং তিনি (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) আরও বলেন:

"তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে, কি বস্তু তাদের জন্য হালাল? বলে দিন: তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হয়েছে। যেসব শিকারী জন্তুকে তোমরা প্রশিক্ষণ দান করো শিকারের প্রতি প্রেরণের জন্যে এবং ওদেরকে ঐ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দাও, যা আল্লাহ্ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। এমন শিকারী জন্তু যে শিকারকে তোমাদের জন্যে ধরে রাখে, তা খাও এবং তার উপর আল্লাহ্'র নাম উচ্চারণ করো..." [সূরা মায়িদাহ্ : ৪]।

এবং আবু সা'লাবা আল-খাসনী বর্ণনা করেছেন যে,

"আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে গেলাম এবং বললাম: 'হে আল্লাহ্'র নবী! আমরা শিকারের জন্য উপযোগী ভূমিতে বসবাস করি, আমি তীর এবং প্রশিক্ষিত ও অপ্রশিক্ষিত কুকুরের মাধ্যমে শিকার করি, সুতরাং আপনি আমাকে বলে দিন যে, এদের কোনটি আমার জন্য অনুমোদিত?" তিনি (সাঃ) বলেন: "তোমার দেয়া বর্ণনা অনুসারে, তুমি একটি শিকার উপযোগী ভূমিতে বসবাস করো; সুতরাং তুমি আল্লাহ্'র নামে তোমার তীর দিয়ে যা শিকার করো তা থেকে ভক্ষণ করো, এবং তুমি যদি আল্লাহ্'র নামে তোমার প্রশিক্ষিত কুকুর দিয়ে শিকার করো, তাহলে শিকারের সময় ও সেটি খাবারের সময় আল্লাহ্'র নাম উচ্চারণ করো, এবং তুমি যদি তোমার অপ্রশিক্ষিত কুকুর দিয়ে যদি শিকার করো এবং মৃত্যুর পূর্বে শিকারটিকে সংগ্রহ ও জবাই করতে পারো তবে তা থেকে ভক্ষণ করো।" (আন-নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ্ কর্তৃক বর্ণিত)

দালালি এবং কমিশন এজেন্সী (সামসারা এবং দালালা)

দালাল হচ্ছে এমন একজন ব্যক্তি যাকে অন্যান্য ব্যক্তি তাদের পক্ষ হয়ে কোন কিছু ক্রয় বা বিক্রয়ের জন্য নিয়োগ করে থাকে। একজন কমিশন এজেন্টকেও এভাবেই নিয়োগ দেয়া হয়। সামসারা (দালালি) হল এমন এক ধরনের কাজ যার মাধ্যমে কোন সম্পত্তি বৈধভাবে অধিকৃত হয়। আবু দাউদ তার সুনানে উল্লেখ করেছেন যে, কায়েস ইবনে আবু ঘুরজা আল-কাননী বলেছেন:

আমরা মদীনাতে আউসাক (বোঝাই করা মালামাল) ক্রয় করতাম এবং নিজেদেরকে দালাল বলে অভিহিত করতাম। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাদের কাছে আসলেন এবং আমাদেরকে আগের চেয়ে উত্তম একটি নামে ডাকলেন। তিনি (সাঃ) বলেন: **"হে বণিকগণ, সাধারণত ব্যবসা হচ্ছে মূর্খ কথাবার্তা ও শপথের কালিমাযুক্ত, সুতরাং একে সাদাকার সাথে মিশ্রিত করো।"** এর অর্থ হলো, ব্যবসায়ীরা তার পণ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে এমনভাবে সীমালঙ্ঘন করে

যে, তা মূর্খতার পর্যায়ে পড়ে যায় এবং পণ্যকে বিক্রয় করার জন্য মিথ্যা প্রতিশ্রুতিও দিয়ে ফেলে। তাই তার কাজের প্রতিফল থেকে মুক্তি লাভের জন্য সাদাকা দেয়া অধিকতর পছন্দনীয়। ক্রয়-বিক্রয়ের যে কাজের জন্য লোকটি চুক্তিবদ্ধ হয়েছে সেটি সুনির্দিষ্ট হতে হবে, এটি হতে পারে পণ্যের ভিত্তিতে কিংবা সময়ের ভিত্তিতে। সুতরাং, কেউ যদি একটি বাড়ী বা কোন সম্পত্তি বিক্রয় বা ক্রয় করার জন্য কাউকে একদিনের জন্যও নিয়োগ দেয় তবে সেটি বৈধ হবে। কিন্তু সে যদি অনির্দিষ্ট কোনো কাজের জন্য কাউকে নিয়োগ দেয় তবে তা অবৈধ হবে।

নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির কিছু কাজের ক্ষেত্রে দালালি প্রযোজ্য নয়। যেমন: এক ব্যবসায়ী অন্য আরেক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করার জন্য একজন এজেন্ট নিয়োগ দিলো, এবং বিক্রেতা তার কাছ থেকে ক্রয় করার প্রতিদানে এজেন্টকে কিছু অর্থ প্রদান করলো। যদি এজেন্ট এই অর্থ পণ্যের মূল্য থেকে বাদ না দিয়ে নিজের জন্য কমিশন হিসেবে রেখে দেয় তবে শারী'আহ্ এটিকে দালালি হিসেবে অনুমোদন দেয় না, কারণ নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি ব্যবসায়ীর জন্য একজন এজেন্ট হিসেবে কাজ করে, তাই পণ্যের মূল্য যতটুকু কমানো হয় তা নিয়োগকারী ব্যবসায়ীর জন্য, এজেন্টের জন্য নয়। অতএব, এজেন্টের জন্য এই অর্থ গ্রহণ করা নিষিদ্ধ, কারণ তা ক্রেতার অধিকারভুক্ত, যদি ক্রেতা তা গ্রহণের অনুমতি প্রদান করে তবেই তা গ্রহণ করা তার জন্য বৈধ হবে।

একইভাবে, যদি কোনো ব্যক্তি একটি পণ্য ক্রয় করার জন্য তার বন্ধু বা ভৃত্যকে প্রেরণ করে এবং বিক্রেতা তার কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করার জন্য বন্ধু বা ভৃত্যকে কোনো সম্পত্তি প্রদান করে, অর্থাৎ কমিশন প্রদান কওে তবে সে বন্ধু বা ভৃত্যের জন্য তা গ্রহণ করা অনুমোদিত নয়, কারণ সেটা দালালি নয়, বরং সেটা প্রেরণকারী ব্যক্তির সম্পত্তি থেকে চুরি হিসেবে বিবেচিত হবে। এর কারণ হলো, এ সম্পত্তি তারই যে তাকে ক্রয় করতে পাঠিয়েছে এবং কখনই যাকে পাঠানো হয়েছে তার জন্য নয়।

মুদারাবা

মুদারাবা হলো দুই বা ততোধিক ব্যক্তির ব্যবসায় অংশগ্রহণ, যাতে একজন মূলধন এবং অন্যজন শ্রম বিনিয়োগ করে। অর্থাৎ, একজন ব্যক্তির শ্রমের সাথে আরেকজন ব্যক্তির সম্পত্তি অংশীদারিত্বে উপনীত হয়। এর অর্থ হচ্ছে যে, একজন কাজ করবে এবং অন্যজন সম্পত্তি বিনিয়োগ করবে। সুনির্দিষ্ট পরিমাণে লাভ ভাগাভাগি করে নেয়ার ব্যাপারে দু'জন অংশীদার একমত হয়। এর একটি উদাহরণ হচ্ছে, যখন একজন ব্যক্তি এক হাজার পাউন্ড বিনিয়োগ করে ও অন্যজন সেটা দিয়ে কাজ করে এবং প্রাপ্ত লাভ তাদের দু'জনের মধ্যে বন্টিত হয়। শ্রম বিনিয়োগকারী অংশীদারকে অর্থ হস্তান্তর করতে হবে এবং অর্থের উপর তাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে, কারণ মুদারাবাতে শ্রম বিনিয়োগকারী ব্যক্তিকে সম্পত্তি হস্তান্তর করে দিতে হয়। শ্রম বিনিয়োগকারী অংশীদার সম্পদ বিনিয়োগকারী অংশীদারের উপর এমন শর্তারোপ করতে পারে যে, লভ্যাংশের এক-তৃতীয়াংশ বা অর্ধেক তাকে দিতে হবে, কিংবা লভ্যাংশের সুনির্দিষ্ট অংশ ভাগ করে নেয়ার ব্যাপারে তারা ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারে। এটি একারণে যে, মুদারিব বা শ্রম বিনিয়োগকারী অংশীদার তার কাজের জন্য লভ্যাংশে অধিকার দাবী করতে পারে। অতএব, অংশীদারদের জন্য এটা অনুমোদিত যে তারা মুদারিবের অল্প অথবা অধিক পরিমাণ লভ্যাংশ প্রাপ্তির বিষয়ে একমত হতে পারে। সুতরাং, মুদারাবা এমন এক ধরনের কারবার যা মালিকানা অর্জনের বৈধ পন্থা। এর ফলে মুদারিব সম্পত্তির মালিকানা লাভ করতে পারে, যা সে পারস্পরিক ঐক্যমত্য অনুযায়ী কাজ করে মুদারাবার মাধ্যমে লভ্যাংশ হিসেবে অর্জন করে থাকে।

মুদারাবা হচ্ছে একধরনের কোম্পানী, কারণ এটা হচ্ছে শ্রম ও সম্পদেও অংশীদারিত্ব। শারী'আহ্ কর্তৃক অনুমোদিত লেনদেনসমূহের একটি হচ্ছে এধরনের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। আবু হুরায়রাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন:

"আল্লাহ্ বলেন: 'দুইজন অংশীদারের মধ্যে আমি তৃতীয়জন, যতক্ষণ পর্যন্ত একজন আরেকজনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করে। যদি তাদের একজন আরেকজনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তবে আমি নিজেকে সেখান থেকে অপসারণ করে নেই।" রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন:

"আল্লাহ্'র হাত ততক্ষণ পর্যন্ত দুইজন অংশীদারের উপর থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা পরস্পরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করে।" আল-আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব বর্ণনা করেছেন যে, যখন তিনি কোনো সম্পত্তি মুদারাবা হিসেবে হস্তান্তর করেন তখন তিনি মুদারিবের উপর শর্তারোপ করতেন যে, এটি নিয়ে সে সমুদ্রে ভ্রমণ করতে পারবে না, কোনো উপত্যকায় অবরোহণ করতে পারবে না, কিংবা জীবন্ত কোনো কিছু নিয়ে ব্যবসা করতে পারবে না, অন্যথায় সে নিশ্চিতভাবেই ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ ব্যাপারে জানতেন এবং তিনি (সাঃ) এটিকে অনুমোদন দিয়েছেন। সাহাবীগণ (রা.) নিরঙ্কুশভাবে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, মুদারাবা অনুমোদিত। সাধারণত উমর ইবনে আল-খাত্তাব (রা.) এতিমদের সম্পত্তি মুদারাবা হিসেবে হস্তান্তর করতেন। উসমান ইবনে আফফান (রা.) কিছু সম্পত্তি মুদারাবা হিসেবে এক ব্যক্তিকে হস্তান্তর করেন। সুতরাং, মুদারিব অন্য একজনের সম্পত্তিকে ব্যবহার করে সম্পত্তি অর্জন করে থাকে। অতএব, মুদারিব কর্তৃক সম্পাদিত মুদারাবা হচ্ছে একধরনের কাজ এবং মালিকানা অর্জনের একটি বৈধ পন্থা। সম্পদের মালিকের জন্য এটি মালিকানা অর্জনের পন্থা নয়, বরং এটি মালিকানা বিনিয়োগের একটি মাধ্যম।

বর্গাচাষ (মুসাকাত)

কাজের আরেকটি ধরন হচ্ছে মুসাকাত, যাতে একজন ব্যক্তি তার গাছসমূহকে সেচ প্রদান ও তত্ত্বাবধান করার জন্য কারো কাছে সেগুলো হস্তান্তর করে এবং এর বিনিময়ে তাকে গাছগুলো থেকে প্রাপ্ত ফলের একটি সুনির্দিষ্ট অংশ প্রদান করে। এটাকে বলা হত মুসাকাত (পারিভাষিক অর্থ সেচকার্য), কেননা এটি সেচকার্যের সাথে সংশ্লিষ্ট; হিজাজের লোকদেও গাছে প্রচুর পরিমাণে সেচ প্রয়োজন হতো, আর তারা তা কূপ থেকে সংগ্রহ করতো। মুসাকাত এমন এক ধরনের কাজ যা শারী'আহ্ কর্তৃক অনুমোদিত। মুসলিম বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা.) বলেছেন:

"রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) খায়বারের লোকদের সাথে অর্ধেক ফল ও বৃক্ষের ভিত্তিতে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন।" মুসাকাত সাধারণত তাল গাছ ও লতাজাতীয় গাছের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য – যার ফসলের একটি সুনির্দিষ্ট অংশ শ্রমিকদেরকে দেয়া হয়। এটা শুধুমাত্র ফলবান গাছের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেসব গাছে ফল উৎপনড়ব হয় না, যেমন: উইলো, কিংবা ফল হলেও তা সংগ্রহ করা হয় না, যেমন: পাইন ও সিডার, সেগুলোর ক্ষেত্রে মুসাকাত প্রযোজ্য নয়, কারণ মুসাকাত ফলের একটি অংশের জন্য প্রযোজ্য এবং এ ধরনের গাছ হতে কোনরূপ ফল অন্বেষন করা হয় না। কিন্তু যেসব গাছ হতে পাতা অন্বেষণ করা হয়, যেমন: তুঁত ও গোলাপ গাছ, সেগুলোর ক্ষেত্রে মুসাকাত প্রযোজ্য, কারণ এগুলোর পাতা ফলের সমপর্যায়ের। এগুলো থেকে বছরান্তে ফসল পাওয়া যায় এবং এগুলো সংগ্রহ করা সম্ভব, এবং এগুলোর একটি অংশের বিনিময়ে মুসাকাতে প্রবেশ করা যায়, আর একারণে ফলের মতই এক্ষেত্রে একই হুকুম প্রযোজ্য।

একজন কর্মচারী বা শ্রমিককে নিয়োগ প্রদান

ইসলাম একজন ব্যক্তিকে তার হয়ে কাজ করার জন্য কর্মচারী ও শ্রমিক, অর্থাৎ কর্মী নিয়োগ করার অনুমতি প্রদান করেছে। আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

"এই পৃথিবীতে আমি তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বন্টন করেছি এবং একের পদমর্যাদাকে অপরের উপর উন্নীত করেছি, যাতে কিছু ব্যক্তি অপরকে তাদের কাজে নিয়োগ দিতে পারে..." [সূরা যুখ্রুফ : ৩২]

ইবনে শিহাব বর্ণনা করেছেন যে, উরওয়াহ্ ইবনে আজ-জুবায়ের বলেছেন যে, উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.) বলেন:

"রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং আবু বকর (রা.) বনু আদ-দীল থেকে অভিজ্ঞ পথ নির্দেশক হিসেবে এক ব্যক্তিকে ভাড়া করেছিলেন, যে তখনও কুরাইশদের কুফ্ফার দ্বীনের মধ্যে ছিল। তারা তার কাছে তাদের দু'টি ভারবাহী মাদী উট হস্তান্তর করলেন এবং তিনরাত পর সকালবেলা দু'টি উটসহ সাওর-এর গুহায় তাদের সাথে সাক্ষাতের সময় ধার্য করলেন।"

এছাড়াও, আল্লাহ্ (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্যদান করে, তবে তাদেরকে প্রাপ্য পারিশ্রমিক দেবে।" [সূরা ত্বালাক: ৬]

আবু হুরাইরাহ্ (রা.) থেকে বুখারী বর্ণনা করেছেন যে, "রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন:

"আল্লাহ্ আজ ওয়া যাল্লা বলেন: বিচার দিবসে আমি তিন ধরনের ব্যক্তির প্রতিপক্ষ হবো: একজন হলো সে ব্যক্তি যে আমার নামে কাউকে কোনো কথা দিলো এবং পরবর্তীতে তা ভঙ্গ করলো, যে একজন আজাদ ব্যক্তিকে বিক্রয় করলো এবং এর মূল্য গ্রাস করল এবং যে ব্যক্তি কোনো কাজের জন্য কাউকে ভাড়া করলো এবং পুরো শ্রম দেয়ার পরও তাকে তার পারিশ্রমিক দিলো না।" নিয়োগ প্রদানের অর্থ হচ্ছে, নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিয়োগকারীকে কোন সুবিধা প্রদান করে এবং এর বিনিময়ে নিয়োগকারী হতে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি সম্পদ লাভ করে। সুতরাং এটিকে এমন একটি চুক্তি হিসেবে বর্ণনা করা যায় যেখানে ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিনিময়ে উপযোগ (কাজ হতে প্রাপ্ত সুবিধা) পাওয়া যায়। শ্রমিকের কাজের উপযোগের উপর ভিত্তি করে অথবা শ্রমিকের উপকারিতার কথা বিবেচনা করে একজন শ্রমিককে ভাড়া করার চুক্তি করা হয়। যদি চুক্তিটি কাজের উপযোগের উপর নির্ভর করে সম্পাদন করা হয় তবে চুক্তিকৃত বিয়য়টি হলো কাজ দ্বারা সৃষ্ট উপযোগ, যেমন: কোন বিশেষ কাজের জন্য কারিগর ভাড়া করা, পরিচ্ছনতা কর্মী ভাড়া করা, কামার বা ছুতার ভাড়া করা। তবে চুক্তিটি যদি ব্যক্তির নিজস্ব মানবীয় উপযোগিতার কথা বিবেচনা করে করা হয় তাহলে চুক্তির বিষয়বস্তু হলো ব্যক্তির উপযোগিতা, যেমন: একজন ভৃত্যকে ভাড়া করা এবং এধরনের সকল শ্রমিক। এ ধরনের চুক্তিতে শ্রমিক নিয়োগকারীর জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে কাজ করে, যেমন: যে ব্যক্তি সুনির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে একটি কারখানা বা বাগানে কাজ করে, কিংবা একজন কৃষক। সরকারী কর্মচারীরা এর আওতায় পড়ে। বিকল্পভাবে, একটি সুনির্দিষ্ট কাজের বিষয়ে তার দক্ষতা থাকতে পারে, মজুরির বিনিময়ে যেকোন ব্যক্তির জন্য কাজটি সে করে দিতে পারে। এ ধরনের কাজের উদাহরণ হলো ছুতার, দর্জি ও মুচীর কাজ। প্রম ধরনের কাজ হলো ব্যক্তি পর্যায়ের কাজ এবং দ্বিতীয় ধরনের কাজ হল সাধারণ শ্রম।